সাহিত্যের
সমস্যা
নারায়ণ চৌধুরী

সাহিত্যের সমস্যা

নারায়ণ চৌধুরী

॥ পপুলার লাইব্রেরী ॥

প্রকাশক :
শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী,
পপুলার লাইব্রেরী,
১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬
তিন টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস,
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ,
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বাণী ও সুরের একনিষ্ঠ সাধক

পরমশ্রদ্ধাভাজন

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

করকমলে

লেখকের অন্যান্য বই ॥

সঙ্গীত-পরিক্রমা
বাংলার সাহিত্য
বাংলার সংস্কৃতি
সমকালীন সাহিত্য
আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন
অর্থ বর্ণপরিচয় কথা
অম্ল-মধুর
আত্মদর্শন
মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার (জীবনী)

নিবেদন

'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে মোট বারোটি প্রবন্ধ সংকালত হল। এই প্রবন্ধগুলি ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র প্রবন্ধই বেশী। 'বাংলার মফঃস্বল শহর' প্রবন্ধটি বাদে অন্য সকল প্রবন্ধ গত পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা।

প্রবন্ধগুলি যদিও আপাতবিচ্ছিন্ন, তা হলেও তাদের ভিতর একটা সাধারণ ভাবৈক্য বর্তমান। সচেতন পাঠকের চোখে বক্তব্যের ক্রম-পরম্পরা ধরা পড়বে বলে মনে হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্য, আরও সংকুচিত অর্থে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, আলোচনায় মুখ্য স্থান লাভ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিতে এ বই যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সাহায্য করে, স্বীয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

গ্রন্থটির প্রকাশনার ব্যাপারে পপুলার লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র নন্দী যথেষ্ট প্রযত্ন শ্রম ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১লা আষাঢ়,
১৩৬৬

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

॥ জীবনশিল্প ॥

শিল্পসাধনা ও জীবনসাধনা পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু যদি কখনও এই দুই আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তা হলে কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দান করব? শিল্প বড়, না, জীবন বড়? প্রবণতাভেদে এ প্রশ্নের উত্তরে মতবৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিল্পপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমরা জীবনের অনুকূলে রায় দেব। জীবন, শিল্পের চাইতে অনেক—অনেক বড়। কেন, সে কথা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জীবন ও শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্নে প্রথমেই যে কথাটি মনে পড়ে তা হচ্ছে, জীবনের পরিধি, শিল্পের পরিধির তুলনায় অনেকগুণ বিস্তৃততর। এটি পরিমাণগত বিচার, তবে এরও সার্থকতা আছে। জীবনের বহু বিচিত্র দিক, পক্ষান্তরে শিল্প জীবনের একটি দিক মাত্র। জীবনের পরিকল্পনার মধ্যে শিল্পকে অনায়াসে ধরানো যায়, কিন্তু জীবনকে শিল্পের বেড়ের মধ্যে ধরাতে গেলে শিল্পের অপ্রতুলতা অচিরাৎ প্রকট হয়ে উঠবে।

এ রকম ঘটবার কারণ এই যে, শিল্পসাধনা মূলতঃ সৌন্দর্যের সাধনা। কিন্তু জীবনসাধনার মধ্যে নীতি জ্ঞান ধর্ম কর্ম সৌন্দর্য সবই বিধৃত রয়েছে। বহু বিচিত্র প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টার নামই জীবনসাধনা। জীবনে যিনি বড় হতে চান তাঁকে শুধু সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না, তাঁর জীবন—নীতি বুদ্ধি ধর্ম এবং কর্মাদর্শের দ্বারাও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শিল্পীর কর্মপ্রেমিক না হলেও চলে—বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্ম শিল্পী-কবি-ভাবুকের চিত্তকে

বিক্ষিপ্ত করে এবং সে-কারণ তাঁদের সাধনায় বিঘ্ন জন্মায়—কিন্তু জীবন-সাধকের পক্ষে কর্মিষ্ঠ না হলেই নয়। কর্মে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তি পাকা হয় না, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। কর্মশূন্য জীবন জীবন্মৃত অবস্থার দ্যোতক।

নীতি ধর্ম জ্ঞান এ সকল বিষয়েও শিল্পের অপূর্ণতা প্রকট। শিল্প-সাধনার তলায় তলায় নীতিজ্ঞান অনুস্যূত থাকলেও শিল্পচর্চার সঙ্গে নীতিচর্চার যোগ আবশ্যিক নয়। বরং সমালোচকেরা সচরাচর নীতিকে সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিপন্থী বলে মনে করেন। সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলায় নীতিজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রাধান্যে রসিকচিত্ত পীড়িত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির অনবদ্য নিদর্শন, সেই তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিংবা 'বিষবৃক্ষ' তত উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি নয় এই কারণে যে, অত্যুচ্চারিত নীতিকথার রূঢ় হস্তাবলেপে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সৌন্দর্য কতকাংশে মলিন হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে নীতিবাদের সম্পর্ক তবু বরং কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার করে নেওয়া চলে, কিন্তু সঙ্গীত প্রভৃতি বিমূর্ত (abstract) শিল্পকল্পার সঙ্গে নীতির সম্পর্ক প্রায় নেই। সঙ্গীতের মূল কথা হল—রস ; সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া সঙ্গীতের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন রন্ধ্রপথেই নীতি এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না।

কিন্তু নীতিবোধশূন্য জীবন অর্থহীন। ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, পাপ-পুণ্যের বোধ, জীবনের মর্মমূলে নিহিত। কোন কোন দার্শনিক—যেমন কাণ্ট—নীতিজ্ঞানকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির মর্যাদা দিয়েছেন। কাণ্টের চক্ষে নীতি ধর্মেরও উৎসস্থল। নীতিকে ধর্মের কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ধর্ম থেকে ভাবালুতাকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। নীতির মধ্যে একটা সুনিশ্চিত ঔচিত্যের বোধ আছে, এই ঔচিত্যই মানুষকে ফলপ্রত্যাশা-বিহীন কর্তব্যকর্মে প্রণোদিত করে। কর্তব্যনিষ্ঠায় জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা। প্রাচ্যের দুই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক—বুদ্ধ ও কন্‌ফুসিয়াস্—তাঁরাও

জীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে নীতিবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছেন। নীতিহীন জীবন, কর্ণধারহীন তরণীর মত সতত টলমল, সুতরাং বিনাশমুখী।

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে ; কিন্তু ধর্মবিরহিত জীবন কল্পনা করা যায় না। এক সময়ে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নিগূঢ় ছিল ; প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সেই দেশের ধর্মীয় অন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে সাহিত্যের রূপ ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন, "ধর্ম ভিন্ন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।"* কিন্তু এ কথা আধুনিক যুগের পূর্বে পর্যন্ত সত্য ছিল, আধুনিক যুগে এসে এ প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েছে বলে মনে হয়। এখন আর ধর্ম শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য নয়। অন্ততঃ, আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের বোধ থেকে যে সাহিত্য বহু দূরে চলে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন অনেকাংশে ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাজনীতি। মানুষের চিন্তায় রাজনীতির প্রভাব ক্রমবর্ধমান, সে-কারণ শিল্প-সাহিত্য আজ সুস্পষ্টরূপে রাজনীতির পরিধির অন্তর্গত। রাজনীতি যে-পরিমাণে সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, ধর্ম সে-পরিমাণ সাহিত্য থেকে অন্তর্ধান করেছে। স্পষ্টতঃই শিল্পরাজে ধর্মের পূর্বতন মর্যাদা আর নেই। এক-একটি ধর্মান্দোলনের দ্বারা সাহিত্যের গতি পূর্বে যেভাবে নির্দিষ্ট হত, এখন আর তেমন হয় না। ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অন্যূন আট শত বৎসরের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস বিচিত্র ধর্মদ্বন্দ্বের এক অবিচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত; কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা-সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধের

* দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

বাঙালী মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ ছিল প্রধান; সেইটেই এখন বিশ শতকের মধ্যভাগে আন্তর্জাতিকতায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম বা এক-প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের সঙ্গে অন্য-প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের ভেদ এখন আর সাহিত্যকে বিশেষ বিচলিত করে না। এ কথা সকল দেশের আধুনিক-সাহিত্য সম্পর্কেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

কিন্তু জীবন? ধর্মবোধহীন জীবনের কোনই অর্থ হয় না। ধর্মের ভিত্তি নীতি কিংবা ভক্তি, এ নিয়ে জ্ঞানীজনদের মধ্যে বিতর্ক চলতে পারে; কিন্তু এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, মানুষের জীবন কোন-না-কোন আকারে ধর্মবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হওয়া চাই, নইলে জীবন লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। ধর্মের আশ্রয়শূন্য জীবন বায়ুশূন্য হাউইয়ের মত অচিরাৎ চুপসিয়ে যেতে বাধ্য। বাহ্যদৃষ্টিতে, আধুনিক কালের মানুষের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে গভীর ধর্মবোধের পোষকতার সন্ধান মেলে না; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে যে, সমাজের ভাল-মন্দ আজও মুখ্যাংশে সহজাত ধর্মবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্মবোধ আমাদের স্বভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে। আধুনিকতাগর্বী মানুষ জীবন-পরিকল্পনা থেকে ধর্মকে ছাঁটতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, এক অনতিক্রম্য নিয়তির মত ধর্ম মানুষের জীবনের সঙ্গে লেপ্টে আছে। এ নিয়তি থেকে ভবিষ্যতের মানুষেরও নিষ্ক্রমণের উপায় নেই, কেন-না এইটেই মানুষের বিধিলিপি। সমাজে যাঁরা বড় হন, তাঁরা ধর্মের পথ অনুসরণ করেই বড় হন; অধর্মাচারীরা যুগে যুগে অধঃপতনের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে—এই মানুষের অভিজ্ঞতা।

ধর্মের মূলাধার ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু এখনকার কালের প্রগতিবাদী বিজ্ঞানসিদ্ধ মানুষের কানে নাকি 'ঈশ্বর' কথাটা সেকেলে শোনায়, তাই মনে মনে স্বীকার করে নিয়েও অনেকে তাকে বাইরে কবুল করতে চান না। বেশ, ঈশ্বরে যদি এতই আপত্তি, ঐহিক সংসারের পরিভাষা

দিয়েই ধর্মকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্ম আসলে কি? সুগভীর মানবপ্রেম নয় কি? মানবপ্রেমের চর্চায় অহং-এর বিলুপ্তি ও পরার্থপরতার উন্মেষ। প্রেম প্রীতি স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা করুণা আত্মত্যাগ—এ সব হল মানবপ্রেমের বহুবিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি প্রধান অভিব্যক্তি। এগুলির উপযোগিতা পূর্বে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ধর্ম মানুষকে উর্ধ্বগামী করে। এ উর্ধ্বগামিতার প্রয়োজন কোন সময়েই ফুরবে না। তা যদি হয়, ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবনগঠনের কল্পনা, মূঢ়তা মাত্র। সত্যকার জীবনসাধক নিঃশ্বাস-বায়ুর মতই নিজ জীবনে ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেন।

যদি বলেন, শিল্পই বা এই মানদণ্ডে কোন্ ধর্মবিহীন? তার উত্তরে বলব, প্রশ্নটি লাগসইও বটে, আবার লক্ষ্যভ্রষ্টও বটে। ধর্মের অর্থ যদি মানবতাবাদ হয়, তা হলে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কে অস্বীকার করতে পারে? বরং এই অর্থে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় সমকালীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল মানবতাবাদ। রলাঁ-প্রমুখ এযুগের কতিপয় শিল্পিপ্রধান 'Art for Art's sake'-তত্ত্ব বাতিল করে 'Art for Humanity's sake'-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ইউরোপীয় বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের খাতে প্রবাহিত উদার মানবতাবাদের স্রোত সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের তটে এসে আঘাত হানছে। আধুনিক সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রবণতার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের পর্ব থেকে যাত্রারম্ভ করে রাজনীতি তার অভিযান ক্রমেই প্রসারিত করে চলেছে। মার্ক্সবাদ আধুনিক রাজনীতির একাংশ জুড়ে আছে। দলবিশেষের নিকট মার্ক্সবাদ ধর্মের বাড়া। এই দলের প্রচারিত সাহিত্যে মার্ক্সবাদের অনুকূলে যে উদ্যম পরিলক্ষিত হয়, তা মধ্যযুগের ধর্মযোদ্ধাদের উদ্যমকেও বুঝি হার মানায়। এই

মানদণ্ডে শিল্প-সাহিত্য আজও ধর্মীয় উন্মাদনার লক্ষণমুক্ত হতে পারে নি, সে কথা সত্য।

কিন্তু আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি একটু অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা দেখতে পাব, এই-যে মানবতাবাদ, এই-যে মার্ক্সীয় চেতনা—এ সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, ধর্মের স্থলাভিষিক্ত রাজনৈতিক চিন্তার আন্দোলনগুলি তেমন করে বুঝি শিল্প-সাহিত্যকে কখনও কুক্ষিগত করতে পারবে না। বর্তমান শিল্প-সাহিত্যের উপর রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একটা জায়গায় এসে এই প্রভাব-প্রক্রিয়া থেমে যেতে বাধ্য, তার কারণ ইতিমধ্যে নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) আদর্শের প্রসার ঘটেছে, শিল্পরচনাকে এখন রসোত্তীর্ণ হতে হলে উৎকর্ষের দুরূহ মান অতিক্রম করতে হয়। পূর্বে ধর্মীয় সাহিত্যের অধ্যায়ে রামায়ণ-মহাভারতের যে কোন প্রকারের অনুবাদই আমাদের দেশে সাহিত্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে; বাংলা লৌকিক কাব্যে এক মনসাদেবীর উপাখ্যানেরই (পদ্মপুরাণ) যে কত বিভিন্ন সংস্করণ আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু এখন যুগধর্মের পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পীর উপর শিল্পের দাবি আজ অতি-প্রচণ্ড, ক্ষমাহীন। মানবতাবাদের লক্ষণাক্রান্ত হলেই সাহিত্য জাতে উঠল—এ রকম সুবিধা পাওয়ার উপায় আর নেই। নকল আর শৌখিন মজদুরির দ্বারা সাহিত্যের খ্যাতি কিছুকালের জন্য আত্মসাৎ করা যেতে পারে, কিন্তু সত্য-মূল্য না দেওয়ার এই ফাঁকি সৌন্দর্য-বিচারের কঠিন পরীক্ষায় দু' দিনেই ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। আমরা শিল্প-সংস্কৃতির পথে যত এগিয়ে চলেছি, শিল্পবিচারের মানদণ্ড তত কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। অব্যভিচারী সৌন্দর্যতত্ত্বের সূত্রের দ্বারা এক্ষণে শিল্প-সাহিত্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তেমন-তেমন ভাবে

দেখলে শিল্পের স্বক্ষেত্র বলতে সৌন্দর্যায়ণ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতিই বুঝি আজ অঙ্গুলিনির্দেশ করা চলে না।

এর পর জ্ঞানের কথা। শিল্প জ্ঞানের দ্বারা সঞ্চালিত হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু জীবনে জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্যসন্ধান; জ্ঞানের লক্ষ্য সত্যসন্ধান। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস শেক্সপীয়র গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কতিপয় মহাকবির মধ্যে সৌন্দর্য এবং জ্ঞান-সাধনা একীভূত হয়ে গেছে দেখতে পাই, কিন্তু এটি আমাদের উপরন্তু লাভ। সকল শিল্পীর পক্ষে এ কথা খাটে না। শিল্পের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগের দৃষ্টান্ত বিরল ও দীর্ঘছেদযুক্ত। এ যোগ বাস্তব, কিন্তু অবধারিত নয়। অধিকাংশ কাব্য নাটক উপন্যাস ছোটগল্প জ্ঞানবিযুক্ত হয়েও স্রেফমাত্র সৌন্দর্যের দাবিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাহিত্যের উপাদান জ্ঞানগর্ভ হলে ভাল কথা, না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে তার কোন মতেই ভ্রষ্ট হওয়া চলবে না। শিল্পের ভাববস্তু (content) এবং রূপকারুর (form) তুল্যমূল্যের প্রশ্নে রূপকারু ক্রমশঃ ভাববস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ভাব অপেক্ষা ভাবের বাস্তবায়িতকরণের (externalization) সমস্যা ক্রমেই শিল্পের প্রধান সমস্যা হয়ে উঠছে।

কিন্তু জীবনের ক্ষেত্র আলাদা। সেখানে জ্ঞানের দাবি অপ্রতিরোধ্য। জ্ঞানের দাবি অপ্রতিরোধ্য এই কারণে যে, জ্ঞান ছাড়া সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোন্ পথ গ্রহণীয়, কোন্ পথ বর্জনীয়, দুঃখ-কষ্ট জয় করার কী উপায়, সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে আমাদের কী করা দরকার—এ-সব প্রশ্নের যথার্থ সমাধান একমাত্র জ্ঞানের আলোকেই হওয়া সম্ভব। নীতি বা ধর্মের বোধ মানুষের মধ্যে সহজাত, এই বোধ আছে বলেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। কিন্তু রিপু বা দুঃখ-জয়ের বাস্তব কৌশল উদ্ভাবনায় এই বোধ থাকাই

বোধ করি যথেষ্ট নয়। তার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় চিন্তায় যাকে প্রজ্ঞা বা বোধি বলে, তা জ্ঞানসাধনারই পরিণামফল মাত্র। এই অবস্থা একবার আয়ত্ত হলে সুখদুঃখের বোধ সমান হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের উপর রিপুর আর কোন প্রভাব খাটে না। সমদর্শিতা বা সমদৃষ্টিই হল জ্ঞানসাধনার মূল কথা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জ্ঞানীর উদয় হয়েছে, তাঁরা মুখ্যতঃ এই সম্যক্ ও সমদর্শিতারই চর্চা করে গেছেন। জ্ঞান শুধু বিদ্যা বা অভিজ্ঞতার সংগ্রহ নয়; জ্ঞান হল আচার, ব্যবহার-বিধি। বিনয়ের শিক্ষা, সদ্ধর্মের শিক্ষা, সংযমের শিক্ষা আমরা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করে থাকি। জ্ঞানচর্চার সঙ্গে জীবনচর্চার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠতার কারণে জীবনসাধনায় জ্ঞানচর্চা একটি মস্ত জায়গা জুড়ে আছে। শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলায় জ্ঞানের প্রয়োজন এমন অসংশয় ভাবে কখনও অনুভূত হয় না। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচিন্তায় জীবনের সার্থকতার উপায় হিসাবে আত্মসমাহিত জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ্ এবং বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হল—জ্ঞান। সাংখ্য এবং বেদান্ত-দর্শনের উপলব্ধি মুখ্যতঃ জ্ঞানেরই উপলব্ধি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী কালের দার্শনিকদের মধ্যে স্পিনোজা যে পথ বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন, সে-ও এই জ্ঞানের পথ। যাকে বলে understanding বা প্রদীপ্ত বুদ্ধি, সেই জ্ঞানালোকের পথেই তাঁরা জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন এবং অপরকে খুঁজতে বলেছেন। যুক্তিজ্ঞানকে তাঁরা জীবনের একেবারে কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাকি রইল সৌন্দর্য। জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজন কে অস্বীকার করতে পারে? সৌন্দর্যের দাবি শিল্পের বেলায় যেমন ষোল-আনা

সর্বগ্রাসী, জীবনের বেলায় তেমন না হতে পারে; কিন্তু এ কথা কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে, জীবনের রূপ মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে, কমনীয় করে তুলতে জীবনেও সৌন্দর্য-অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্যচর্চার একটি মস্ত লাভ এই যে, তা থেকে অফুরন্ত আনন্দ পাওয়া যায়। এ শুধু চক্ষুর বা শ্রবণের তৃপ্তিজনিত আনন্দ নয়, এর সঙ্গে হৃদয়ের ক্ষুধার নিবৃত্তির আনন্দও জড়ানো আছে। বিভিন্ন বস্তুর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিন্যাসের মধ্যে যে ছন্দ বর্তমান, তা যেমন আমাদের আনন্দ দেয়, তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ঐক্যের অন্তর্নিহিত ছন্দও আমাদের মনকে আনন্দে পরিপ্লুত করে তোলে। সৌন্দর্যের এক দিকে হল রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের আনন্দ, অন্য দিকে হৃদয়রঞ্জনী আনন্দ। অর্থাৎ এক দিকে প্রকৃতি, অন্য দিকে প্রেম। এ দুয়ে মিলে সৌন্দর্যের বৃত্ত পূর্ণ। শোভনতা-বর্জিত জীবন যেমন অর্থহীন, তেমনি প্রেমহীন জীবনও অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের ভিতরের কথাটা এই যে, সৌন্দর্য ও প্রেম-শূন্য জীবন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত, সুতরাং ব্যর্থ। জীবনের মূলে ভালবাসারূপ যে হ্লাদিনী শক্তি আছে, নন্দিনী তারই প্রতীক। এই যদি জীবন সম্পর্কে অন্যতম সার কথা হয়, তা হলে কিসের জোরে আমরা জীবন-পরিকল্পনা থেকে সৌন্দর্যকে বাদ দেব? শিল্পের প্রধানতম, সম্ভবতঃ একতম আশ্রয়—সৌন্দর্য; তা বলে সেটি শিল্পেরই একচেটিয়া বস্তু নয়। জীবনেও তার প্রয়োজন কিছু কম নয়। অন্য কতিপয় মৌলিক প্রবণতার সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রবণতাও জীবনের মূলে প্রাণরস জোগাচ্ছে। সৌন্দর্যের ক্ষুধা শুধু শিল্পিস্বভাবে নয়, মনুষ্যস্বভাবেও চিরন্তন।

তা ছাড়া, আর কোন কারণে যদি না-ও হয়, নিছক সুরুচির জন্যই জীবনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য-সাধনার প্রয়োজন আছে। যাকে আমরা শালীনতা বলি, শোভনতা বলি, পরিমার্জিত আচরণ বলি, তার উদ্ভব

সৌন্দর্যবোধ থেকে। আমাদের মধ্যে ছন্দ এবং পারিপাট্যের ধারণা সহজাত বলেই বাক্যে আচরণে চিন্তায় কেউ শোভনতার গণ্ডী অতিক্রম করলে আমাদের মনের সুর কেটে যায়। বেশে, ভূষায়, গৃহসজ্জায়, পরিবেশ রচনায়, সর্বত্রই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে রুচিনিষ্ঠা প্রত্যাশা করি। সর্বপ্রকার অভব্য আচরণ ও বিসদৃশ দৃশ্যে আমাদের যে চিত্তক্লেশ, তার মূলে নীতিবাদ অপেক্ষা সৌন্দর্যবাদের প্রভাব সমধিক সক্রিয় বলে মনে হয়।

কাজেই নীতি জ্ঞান ধর্ম কর্ম সৌন্দর্য—এ সবই সার্থক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। শিল্পের একটি মাত্র ফ্রণ্ট—সৌন্দর্যায়নের ফ্রণ্ট; পক্ষান্তরে জীবনকে একই কালে নানা ফ্রণ্টে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। একটি বা দুটি ফ্রণ্টের উপর মনোযোগ ন্যস্ত করে অন্য ফ্রণ্টগুলিকে আল্‌গা দিলে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার চেতনায় জীবন ভরে উঠতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই আমরা খণ্ডিত জীবন যাপন করি। প্রবণতাভেদে কেউ কর্মের উপর, কেউ জ্ঞানের উপর, কেউ ভক্তির বা নীতির উপর ঝোঁক দিই। অধিকতর শক্তিমান কারও কারও মধ্যে একাধিক প্রবণতার সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কিন্তু এর কোনটাই সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শের কোঠায় পড়ে না। সত্যিকার জীবনসাধক তিনি, যিনি ওই সব কটি প্রবণতার মধ্যেই সামঞ্জস্যবিধানের সাধনায় নিরত। এ যে কী কঠিন সাধনা তা সহজেই অনুমান করা চলে। জীবনের যে-কোন একটি দিকে কাজ-চালানো-গোছের নৈপুণ্য অর্জন করাই অতি দুরূহ ব্যাপার, সে স্থলে এই সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের অভিযানের দুরূহতা কল্পনীয়। শিল্পের দৃষ্টি খণ্ডিত, পক্ষান্তরে অখণ্ডত্বই বিচিত্রপথগামী জীবনসাধনার মর্মবস্তু। শিল্পসাধনার তুলনায় এ সাধনা অনেক বেশি কঠিন।

জীবন-সাধনার দুরূহতার আরও একটি কারণ নির্ণয় করা চলে। প্রথমতঃ, বিচিত্র পথে অভিযানের ক্ষমতাটাই অতিশয় বিরল ও

অসাধারণ; তার উপর সেই অভিযান আরও কঠিন হয়, যদি পথগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার ভাব নিহিত থাকে। মুশকিল হয়েছে এই যে, জ্ঞান কর্ম সৌন্দর্য নীতি এইসব বৃত্তি মানুষের জীবনে প্রায়শঃ পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার আকারে দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনে জ্ঞানের আদর্শকে মর্যাদা দিতে গেলে কর্মাদর্শকে মর্যাদা দেওয়া হয় না, আবার সৌন্দর্যের পূজারী হতে গেলে প্রায়শঃ সমাজের স্বীকৃত নীতিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। প্রবল সৌন্দর্যতৃষ্ণার তাড়না অনুভব করেন এমন মানুষ সংসারে খুব বেশী চোখে পড়ে না। উল্লিখিত বৃত্তিগুলি প্রায়ই যেন একটি অন্যটির সঙ্গে প্রতিকূলতার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে চলতে ভালবাসে। একটির বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষিপ্ত না হলে যেন অন্যটির স্ফূর্তি জাগে না। সত্য-নিষ্ঠার সঙ্গে সৌন্দর্যনিষ্ঠার বিরোধে জীবনসাধকের চিত্ত সতত আলোড়িত। এই আলোড়নের ছাপ আমরা একাধিক সাধকের জীবনেতিহাসের মধ্যে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টাকে সব চাইতে কঠিন সাধনা বলেছেন এবং এই মানদণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন—এইটেই হচ্ছে সামগ্রিক জীবনচর্যার সার কথা। আজকালকার মানুষ অধিকাংশই কম বেশী খণ্ডিত এই কারণে যে, সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শ জগৎ-সংসার থেকে লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। বিজ্ঞান এবং কারুবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমরা অল্পবিস্তর Specialisation-এর ভক্ত হয়ে উঠেছি। জীবনকে অখণ্ডভাবে বিচার ও গ্রহণের কথা কেউ আর আজকাল বলে না। বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদেমাপের শিক্ষাব্রতী সবাই স্পেশালাইজেশন-এর ক্ষুরে মাথা মুড়োবার জন্য ব্যস্ত। যে শিক্ষায় জীবনের অখণ্ডত্বের ধারণা

হয়, যে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে সমন্বয়ের ইঙ্গিত বহন করে, সে শিক্ষার আদর্শ এক্ষণে সর্বসাধারণের নাগালের বহির্ভূত উচ্চ শিকায় সংরক্ষিত। স্পেশালাইজেশন-এর আদর্শের অপূর্ণতা তার নামের মধ্যেই নিহিত। স্পেশালাইজেশন মানেই হল—বিশেষীকৃত অর্থাৎ খণ্ডিত বিষয়ের অন্বেষণ।

উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শিল্পও এক ধরণের স্পেশালাইজেশন, শিল্পে গভীর অভিনিবেশ, গভীর প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, তবে সবটুকুই এক-বর্ত্মাভিমুখী। মুখ্যাংশে সৌন্দর্যের খাত বেয়ে শিল্পীর অভিনিবেশের বিস্তার। এমন কথা কখনই বলব না যে, শিল্পে সাফল্য লাভ করতে হলে দুরূহ পরীক্ষার ক্লেশ সইতে হয় না—হয়; তবে অখণ্ড জীবন-সাধনায় ব্রতী কোন ব্যক্তির প্রচণ্ড দ্বন্দ্বসংঘাতের ক্লেশের সঙ্গে সে ক্লেশের তুলনা হয় না। কেউ কেউ বলবেন, শিল্পীর কাজ সৃষ্টিমূলক; অখণ্ড জীবনসাধনার মধ্যে পরিমাণ বা ব্যাপ্তিগত উৎকর্ষ থাকলেও গুণগত উৎকর্ষের বিচারে শিল্পের দাবিই বোধ হয় অগ্রগণ্য। এ যুক্তিও টেঁকে না। কেন-না প্রকৃত জীবনসাধকের হাতে জীবনটাই একটা মস্ত বড় রচনা। জীবনসাধক বিচিত্রপথগামী জীবনযাপনের দ্বারা জীবনকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। তিনি জীবনকে শিল্পরূপ দেন। বোধকরি খতিয়ে দেখতে গেলে জীবনশিল্প সব শিল্পের সেরা। জীবনশিল্প সংরচনের মধ্যে যে মহত্ত্ব বিরাটত্ব সৌন্দর্যোৎকর্ষ প্রকটিত, লৌকিক শিল্পগুলিতে তার শতাংশের একাংশও প্রকটিত হয় কিনা সন্দেহ।

॥ সাহিত্যে ব্যক্তিত্বচর্চা ॥

পূর্ববর্তী নিবন্ধে শিল্প ও জীবনশিল্পের কথা বলেছি। বর্তমান নিবন্ধে শিল্পচর্চায় ব্যক্তিত্ববিকাশের সাধনার কথা বলব। শিল্প-সাহিত্যকে যথার্থ সার্থকতায় মণ্ডিত করতে হলে শিল্পীর পক্ষে স্বীয় ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন বিকাশ ও সম্ভব হলে রূপান্তর একান্ত আবশ্যক।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি নিবন্ধে* আমি বাংলা-সাহিত্যসেবীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা, যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে কিছু বিস্তারিত মন্তব্য করেছিলাম। ওই মন্তব্যাদির ভিতর সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জ্বালা ছিল, অপ্রিয় সত্যভাষণের রূঢ়তা ছিল, তাতে আমার কোন কোন লেখক বন্ধু আমার উপর ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, দু-একজন নিবন্ধটির প্রতিবাদে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্রাঘাতও করেছিলেন। কোন বিষয় সম্পর্কে স্বকীয় অভিমত যখন সুগভীর প্রতীতির আকারে মনের কোণায় বাসা বাঁধে, তাকে প্রকাশ করবার বেলায় ভাষার উপর সময় সময় নিজেরই অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ ঝোঁক পড়ে। রচনার স্বভাবসঙ্গত প্রত্যাশিত মৃদু স্বর ওই সুদৃঢ় প্রত্যয়জনিত আবেগের প্রাবল্যের বশে কখন যে আপনার অজানিতে চড়া সুরে গিয়ে দাঁড়ায়, নিজেরই সে খেয়াল থাকে না। ফলে যা হবার তাই হয়—রচয়িতার অভিপ্রায়ের ভুল মানে করা হয়। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এ স্থলে বক্তব্যটুকুই মাত্র রচয়িতার অভিপ্রেত, বক্তব্যের তীব্রতাটুকু নয়। রচনার ভিতর আবেগপ্রভাবাৎ যদি কোথাও ঝাঁজ প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। বিবেকী

*'বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা' : শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১।

লেখকমাত্রের নিজেরই এই নিয়ে সঙ্কোচের অবধি নেই, অপরে আর তাঁর মনে কতটা গ্লানিবোধ সৃষ্টি করতে পারেন?

আজ সেই একই বক্তব্য কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করব। আজকের কথাগুলির পিছনে যত না দাহ আছে, তার চেয়ে পরিতাপের তাড়না আছে অনেক বেশী। গভীর দুঃখে বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা সম্পর্কে পুনরায় দু-চার কথা লিপিবদ্ধ করতে বসেছি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মাস অতিবাহিত হয়েছে, মনের উপর সময়ের ও পশ্চাদ্‌চিন্তার প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু মূলতঃ আমার পূর্বতন অভিমত পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নি। পূর্বে বক্তব্যের ভিতর যে তীব্রতা ছিল আজ সে তীব্রতার অবসান হয়েছে, কিন্তু বক্তব্যের মৌলিক যৌক্তিকতায় সংশয় প্রকাশের যথার্থ কোন উপলক্ষ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং যত দিন যাচ্ছে তত সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করছি, আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর মনে সাহিত্যসেবা সম্পর্কে কিম্ভূত কতকগুলি ধারণা বর্তমান। সাহিত্যচর্চার নামে ছেলেখেলার মনোভাবটাই বলবৎ ও ব্যাপক। সাহিত্য যে-হেতু শ্রেষ্ঠ অর্থে 'খেলা', ওই অর্থের রন্ধ্রপথে সাহিত্যে বিপত্তিও বড় কম দেখা দেয় নি। খেলার মনোভাব সাহিত্যের উপর আরোপ করতে গিয়ে অনেকে সাহিত্য-অনুশীলনকে নিতান্ত সস্তা একটি তৎপরতায় পর্যবসিত করেছেন। সৃষ্টিধর্মিতার অজুহাতে তুচ্ছ সহজিয়া সাধনের সংস্কার, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার নামে চিন্তাবুদ্ধিহীন অনায়াস লিপিকুশলতার আদর্শ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। বাংলা-সাহিত্যের মানকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হলে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে এই অনুচিত ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

সাহিত্য বিশ্রম্ভচর্চার বিষয় নয়, সেটি সামগ্রিক জীবনসাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্য। খতিয়ে দেখতে গেলে, জীবনসাধনা ও সাহিত্যসাধনা এক ও অভিন্ন। এ উক্তির সমর্থনে আমাদের সাহিত্য থেকে সার্থকতম দুটি

দৃষ্টান্ত দেখানো চলে—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তকে কতকাল আর আমরা লোকচক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে রাখব! তাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদেরও কি তাঁদেরই মত সাহিত্যসাধনাকে জীবনসাধনায় রূপান্তরিত করবার জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই? আক্ষেপ এই যে, এই প্রয়োজনবোধের বিশেষ কোন প্রমাণ চোখে পড়ে না। অধিকাংশ লেখকই সাহিত্য বলতে 'লেখা-লেখা খেলা'র অধিক কিছু বোঝেন না। আধুনিক সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এই বোধ প্রায়-অনুপস্থিত যে, যথার্থ সাহিত্য হল আত্ম-উপলব্ধি ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের শ্রেষ্ঠ এক সাধনা। সাহিত্যব্রতী যত বেশী নিবিড় ভাবে তাঁর ব্রত আঁকড়ে ধরবেন তত তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ও প্রসার ঘটবে। এ জিনিস আধ্যাত্মিক সাধনার স্বগোত্র। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে সাহিত্য-সাধনার প্রণালীগত তফাৎ নিশ্চয়ই অনেকখানি, তবে দুয়ের মূল লক্ষ্যে বোধ হয় খুব বেশী প্রভেদ নেই। কেন-না শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদীর মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পীও আত্ম-উপলব্ধির পথে মুক্তির অভিসারী। আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার আগ্রহ ও শ্রমেরই অপর নাম হল সাহিত্যচর্চা। এই চর্চায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে থাকতে মানুষ এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছয়, যখন যোগী বা তপস্বীর সঙ্গে তার মানসিক জীবনের বড় একটা তফাৎ থাকে না। যোগীরা সংসারনিস্পৃহ, পক্ষান্তরে শিল্পী-সাহিত্যিক সংসারপ্রেমী, জীবনপ্রীতিতে ভরপুর। কিন্তু এই যে ভেদ, এটি হল দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ, দুই বিভিন্ন সাধনমার্গে অবস্থিত দুই বিভিন্ন ব্যক্তির জগৎ ও জীবনকে বিচার করবার প্রণালীর ভেদ; নয়তো তাঁদের উপলব্ধিতে যে খুব বেশী পার্থক্য আছে তা মনে হয় না। তাঁদের সিদ্ধি সমপর্যায়ের, সুতরাং ব্যক্তিত্বও সমপর্যায়ের। তাঁদের সাফল্য কিংবা সার্থকতাবোধ সমগোত্র। খাঁটি অর্থে একজন সাহিত্যসেবী হলেন তপস্বী—দুরূহ ও ছেদহীন আত্ম-অভিব্যক্তির সাধনায় তিনি নিমগ্ন।

আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সাধনার মত এই সাধনারও শেষ বিন্দুতে আছে অহংবোধের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ও মুক্তি।

ক্ষোভের বিষয়, এই দৃষ্টিতে সাহিত্যসেবাকে বিচার করেন খুব কম জন-ই। অধিকাংশের নিকট সাহিত্য হল অবসর-বিনোদন ও সস্তা আমোদ-আহরণের এক লঘু প্রক্রিয়া। কেউ হাল্কা ছাঁদে দু-একটি মিষ্টি কবিতা বা ছোট গল্প লিখলেন, অমনি সাময়িক পত্র-পত্রিকাদির আসরে ডঙ্কা বেজে উঠল—এমন লেখক আর হয় না, অনেক কালের ভিতর সাহিত্যে এমন শক্তিমানের আবির্ভাব হয় নি, ইত্যাদি। এর চাইতে আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছু হতে পারে না। যাঁরা ডঙ্কা বাজান তাঁরা যেমন নিজেকে প্রতারিত করেন, তেমনি যাঁদের নামে ডঙ্কা বাজানো হয় তাঁরাও কম প্রতারিত হন না। এই ডামাডোলের মধ্যে মুশকিল হয় তাঁদের, যাঁরা সত্যকার সাহিত্যসেবী; লৌকিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির অপেক্ষা না রেখে যাঁরা স্বীয় মানসমুকুরের মুখোমুখি হয়ে কঠিন উপলব্ধির সাধনায় নিমগ্ন। চতুর্দিকে সস্তা প্রশংসার কর্ণপটহভেদী জয়নিনাদে মর্মপীড়িত হয়ে ক্ষোভে লজ্জায় অভিমানে তাঁরা স্বয়ংরচিত নিভৃতির বিবরে মুখ লুকোবার পথ খুঁজে পান না। সকল লেখকই পাঠকের প্রীতি ও সমাদর কামনা করেন। তবে তফাতের মধ্যে, কেউ সস্তায় এই প্রীতি অর্জন করতে চান, কেউ তার জন্যে কঠিন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন। শেষোক্ত জনের সংখ্যা আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নিতান্ত মুষ্টিমেয় বললেও চলে। তবু সান্ত্বনা এই যে, তাঁদের ধারা এখনও বিদ্যমান আছে। এখনও আমাদের মধ্যে এমন কোন কোন সাহিত্য-ব্রতী আছেন, যাঁরা মূল্য না দিয়ে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন, সস্তা জনপ্রিয়তায় যাঁদের মন তৃপ্ত হয় না, বরং যত বেশী জনসমাদরের হাতছানি আসে তত তাঁরা কঠিনতর ক্লেশস্বীকারের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হবার জন্যে জনতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। তাঁরা

দুঃখব্রতধারী, স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপপ্রয়াসী। সমাজকে অমৃত ও আনন্দ বিলোবার গুরু দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত, সেই কারণেই যেন আরও বেশী করে তাঁরা ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র পথের আশ্রয়ী। আনন্দ যদিও সাহিত্য-ব্রতীর চরম লক্ষ্য, সহজ আয়াস-প্রয়াসের পথে এবং আরাম-আয়েস বিসর্জন না দিয়ে কদাচ এই লক্ষ্য অধিগম্য হয়ে থাকে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয়জিজ্ঞাসা ভুলভ্রান্তিজনিত অপরিমেয় চিত্তক্লেশের কঠিন পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ না হলে সাহিত্যিক-সিদ্ধির কিনারায় পৌছনো যায় না। বৈষয়িক মানদণ্ডে যে সব জিনিস লোকের কাছ থেকে সচরাচর মূল্য পেয়ে থাকে, প্রকৃত সাহিত্যব্রতীর চোখে সেগুলির মূল্য সামান্য। সাংসারিক সুখভোগের ব্যাপারে অনেকানেক বিষয়ে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত না করলে বুঝি অপরকে ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য বিতরণ করা যায় না।

সাহিত্যসেবার গুণাগুণ নির্ণয়ের একটি প্রধান উপায় হল সাহিত্য-সেবীর ব্যক্তিত্বের বিচার। পূর্বেই বলেছি, যাঁর সাহিত্যনিষ্ঠা যত গভীর, তাঁর ব্যক্তিত্ব তত প্রখর ও অপ্রতিরোধ্য। এই মানদণ্ডের পরীক্ষায় আমাদের সাহিত্যের কয়জন লেখক উত্তীর্ণ হবেন বলা কঠিন। কত কত লেখককে জানি, যাঁরা লিখনপ্রক্রিয়ায় মোটামুটি সিদ্ধকাম, কিন্তু তাঁদের চারিত্র্য বা মেরুদণ্ডের বল নেই বললেই চলে। তথাকথিত লিপিকুশলতার সঙ্গে এই চারিত্রের অভাব কেমন করে খাপ খায় বোঝা দুষ্কর। কেন-না আত্মপ্রকাশের ধারাটাই এমন যে, এই প্রক্রিয়ায় অবিশ্রান্ত ভাবে নিজেকে নিয়োগ করার ফলে মানসিকতার ও প্রবণতার রূপান্তর সাধিত হয়, সহজ ভাল মানুষ অমিত শক্তিধর ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এক কথায় ব্যক্তিত্বের স্বরূপের পরিবর্তন হয়। যিনি ছিলেন অ-কবি তাঁর এই প্রক্রিয়ায় কবি হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। কেন-না গুণিজনদের ধারণা, আত্মপ্রকাশের অবিরত চেষ্টায় মনের ভিতর যে প্রচণ্ড tension-এর সৃষ্টি হয় তার ধাক্কায় কল্পনার অবরুদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হওয়া কিছু

বিচিত্র ব্যাপার নয়। আত্মবিকাশের ক্রমাগত চেষ্টার মধ্যে আছে সৌন্দর্যানুভূতি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হওয়ার অভ্রান্ত সঙ্কেত। লোকে বলে, কল্পনা ও কবিত্বশক্তি সহজাত। এ কথা সত্য হলেও তা আংশিক সত্য মাত্র। কেন-না শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা এই যে, যেটুকু স্বাভাবিক শক্তি মানুষ দৈবানুগ্রহরূপে পায় তাতেই তৃপ্ত থাকলে শিল্পকর্মে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত হয়ে থাকে, ক্ষান্তিবিহীন একনিবিষ্ট চর্চার দ্বারাই শুধু ভিতরের শিল্প-ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উদ্‌ঘাটন সম্ভব।

উদ্‌ঘাটন বলতে এখানে ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তিগত ও গুণগত রূপান্তর দুই-ই বোঝাচ্ছে। আত্মপ্রকাশের অনলস চেষ্টায় শুধু যে কল্পনাশক্তির উত্তরোত্তর বলবৃদ্ধি হয়, তাই নয়, যেখানে কল্পনাশক্তি নেই, মৌলিক সৃজনীশক্তি নেই, তেমন ব্যক্তি-আধারের ভিতর দুর্লভ গুণের উন্মেষ হতেও কোন কোন সময় দেখা যায়। প্রতি মানুষেরই ভিতর অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলে বলা হয়। শিল্পে সাহিত্যে এ কথার যেরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এমন বোধ করি আর কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

তা যদি হয়, তবে সাম্প্রতিক লেখকদের ব্যক্তিত্বের এইরূপ ভাঙা-চোরা চেহারা কেন। অধিকাংশ সাহিত্যিককে দেখলেই মনে হয় আধখানা মানুষ, এমন কি ভগ্নাংশ মানুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। না-আছে বাক্যে দৃঢ়তা, না-পাই চিন্তাশক্তির মৌলিকত্বের পরিচয়। সহজ লিপিনৈপুণ্য অনেকেরই আয়ত্ত, কিন্তু ওই নৈপুণ্য বিশ্লেষণের পরীক্ষায় টেঁকে না এই কারণে যে, তা কঠিন অনুশীলনের পথে অর্জিত হয় নি, ওটি নিতান্তই পড়ে-পাওয়া বস্তু, সংশয়-জিজ্ঞাসা-অন্তর্দ্বন্দ্ববিবর্জিত সহজিয়া আশীর্বাদরূপে তাকে লাভ করা গেছে। স্বীয় শক্তিতে বা ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অধিকাংশ লেখকেরই কোন আস্থা নেই। কারুরই নিজের উপর বিশ্বাস নেই, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহিত্যিক সম্বর্ধনা

দেবার জন্য আগু বাড়িয়ে আছে। কোন একটি সাময়িক-পত্রে সম্বর্ধনা-সংখ্যার বান ডেকেছে বললেও চলে। পারস্পরিক স্তুতির ঠেকো দিয়ে পরস্পরের মনোবল জীইয়ে রাখবার এ এক হাস্যকর প্রয়াস। কৃচ্ছ্রব্রতী অনুশীলনের পথে না গিয়ে প্রায় সকলেই তদ্বির তদারকি ধরাধরির দ্বারা আখের গুছাবার তালে আছেন। প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির দেখা নেই, সাধনার নাম নেই, এদিকে সভা-সমিতির হুল্লোড়। আত্ম-প্রত্যয়নির্ভর নিভৃত একক সাধনার পথে পা বাড়াতে দ্বিধাসঙ্কোচের অন্ত নেই, এদিকে গোষ্ঠী ও সঙ্ঘ গঠনের জন্য আহারনিদ্রা অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম। সবাই মুরুব্বি খোঁজেন, কেউ-ই নিজের ভিতরকার সুপ্ত শক্তিকে ভাল করে উন্মোচিত করার কথা চিন্তা করেন না। প্রত্যয়হীনতা, আরামস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আসক্তি এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর প্রবল কৃচ্ছ্র-সাধনার ক্লেশভার চাপাতে শ্রমকুণ্ঠা ও অনিচ্ছা—এই ত্রিবিধ কারণ সাম্প্রতিক লেখকদের খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মূলে সক্রিয় রয়েছে বলে মনে হয়।

জানি এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বাঙালী জীবনের বদ্ধমূল অর্থ নৈতিক কৃচ্ছ্রতার যুক্তি উত্থাপন করবেন। বাঙালী শিল্পী ও লেখক সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণ-ব্যক্তিত্বের মূল দায়িত্বটুকু তাঁদের আর্থিক দৈন্যের উপর চাপাতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা আমাদের স্বভাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসম্পূর্ণতার দায়িত্ব সর্বাগ্রে আর্থিক অনটনজনিত প্রতিকূল পরিবেশের উপর আরোপের চেষ্টা করি, তারপর অন্য দিকে দৃকপাতের অবসর খুঁজি। মনস্তত্ত্বটি বিশ্বজনীন এবং প্রায় আমাদের প্রকৃতিগত বলা চলে। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের বিচ্যুতির স্খালন হয় না। পাশ্চাত্যের একাধিক শিল্পীর দৃষ্টান্ত জানি, যাঁরা এর চাইতেও অপকৃষ্ট আর্থিক পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবার উপায় অন্বেষণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই সাধনায় জয়ী হয়েছেন। এঁদের

জীবনে যত বাধাবিপত্তি এসেছে, তত তাঁদের মনোবল দৃঢ়তর হয়েছে, সঙ্কল্প কঠিনতর হয়েছে। বিপদ-বাধার রুক্ষ-কঠিন পাথরে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অবিরত শান দিয়েছেন, তাই তাঁদের ব্যক্তিত্ব এত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে এ-জাতীয় সর্বাত্মক প্রয়াসের দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। সস্তায় বাজিমাতের সংস্কারে সকলেই আমরা অল্প-বিস্তর বিশ্বাসী, তাই আমাদের ব্যক্তিত্ব এত নমনীয় দুর্বল ভঙ্গুর। সহজিয়া সাধনার ভ্রান্ত আদর্শ দেশের শিল্পিসমাজকে নিতান্ত পঙ্গু করে রেখেছে। সুলভ স্বতঃস্ফূর্তি ও অনায়াস স্বচ্ছন্দতার ধারণা আমাদের রচনারীতিকে কদাপি বুদ্ধিসচেতন সজ্ঞান প্রয়াসের স্তরে উন্নীত হতে দিচ্ছে না। যে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সচেতন শিল্পমনস্কতা পশ্চাতে নিয়োজিত থাকলে ব্যক্তিত্ব অবিসম্বাদী ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তেমন অধ্যবসায় ও চৈতন্যের প্রখরতা সঞ্জীবিত রাখতে আমাদের দেহ-মনের জড়তার অবধি নেই। জীবন-যন্ত্রে আমাদের সাফল্যের চাবি প্রায় সকলেরই কম বেশী নীচু সুরে বাঁধা, তাই অল্প আয়াসের মধ্যেই আমরা প্রচুর আত্মপ্রসাদের হেতু অহরহ অন্বেষণ করি। আধুনিক বাঙালী লেখকদের মনোজীবনের সব চেয়ে যা ক্ষতি সাধন করেছে তা হচ্ছে 'সহজ সুরে সহজ কথা' বলতে পারার ভ্রান্ত সংস্কার। সহজ কথা সহজ সুরে বলতে পারা খুবই সহজ ব্যাপার, তা কখনও শ্রেষ্ঠ শিল্পাদর্শের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। শিল্প বা সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক স্তরে অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে যদি একবার কোনমতে সহজিয়া লীলার সংস্কার শিল্পিমনকে পেয়ে বসে তা হলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর আর ভবিষ্যতের কোন আশা থাকে না। শিল্প-সাধনার গোড়ার দিকে সহজিয়া আদর্শের মত অনিষ্টকর আদর্শ বুঝি আর কিছু নেই; আমাদের সাহিত্যের কোন কোন মহাজন তাঁদের
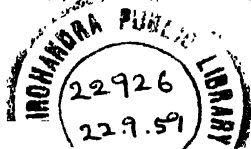
পরবর্তী শিল্প-প্রয়াসীদের সামনে এই আদর্শটি তুলে ধরে দেশের সর্বনাশা ক্ষতি সাধন করে গেছেন। কি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে, কি প্রাচ্য কলারীতির অনুশীলনে, কি আধুনিক গল্পোপন্যাস-কবিতার চর্চায় এই সহজিয়া লীলার এতদূর প্রাধান্য আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় এইটিই প্রধান হেতু যার জন্য আমাদের একালের সাহিত্যিক শিল্পী গায়কদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে সহজিয়া সাধনাকে আদৌ প্রশ্রয় দেন নি, অথচ কি এক দুর্নিরীক্ষ্য কারণে তাঁরই আওতায় ছুটির আনন্দের মহিমা সব চাইতে বেশী প্রকীর্তিত হয়েছে। এটি একালের লেখকদের জীবন-গঠনের পথে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে করি। এই প্রভাবের বশেই মুখ্যতঃ সাহিত্যিকদের জীবন থেকে চারিত্রচর্চা ব্যক্তিত্বচর্চার অভ্যাস লোপ পেতে বসেছে। শিল্পের ললিত লীলায় আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে আমরা ব্যক্তিত্বকে প্রকৃত শক্তিমণ্ডিত করবার কথা বিস্মৃত হয়েছি। প্রাচীন কবিকুল-কথিত সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথ আমরা পরিত্যাগ করেছি। আত্যন্তিক লালিত্যের তুলাস্তূপের তলায় বীর্যবত্তা, দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতার বজ্রলৌহ চাপা পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। সাহিত্য-সাধনা শ্রেষ্ঠ অর্থে নর্মক্রীড়া—এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সাধনার প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া বোধ করি যুক্তিযুক্ত নয়। তাতে হিতের চাইতে অহিতেরই সম্ভাবনা। ক্রমাগত অনুশীলন, দীর্ঘ-স্থায়ী অনুশীলন ও সচেতন অনুশীলনের দ্বারা কঠিনকে সহজের কোঠায় নামিয়ে আনতে হয়। তার আগে পর্যন্ত সহজের বিশেষ সার্থকতা নেই। শিল্পসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়েই কেবল শিল্পকর্ম 'লীলা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, 'খেলা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব পূর্ব পর্যায়গুলি শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এক ছেদহীন অনলস ইতিবৃত্ত। শিল্পীর মানসিক প্রস্তুতির

প্রক্রিয়া তার সমগ্র জীবনের পরিধিতে বিসর্পিত, এই পরিধিপরিক্রমার অন্তেই শুধু সত্যকার আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব। সহজ লীলার সংস্কারের সূচনাও হয় এই অন্তিম পর্বে। শিল্প বা সাহিত্য-সাধনায় সহজ কথা সহজ সুরে বলতে পারাটা শ্রেষ্ঠ সাফল্যের নির্ণায়ক নয়; দুরূহকে ও দুরধিগম্যকে সহজ করে তুলতে পারাতেই বোধ হয় শিল্পকর্মের চূড়ান্ত সার্থকতা। আপাত-দুর্লভ যখন অবলীলাক্রমে এসে হাতের মুঠোয় ধরা দেয়, সেই পাওয়াকেই বলব পরম পাওয়া। এই-যে চরম ও পরম লাভ, এর আশায় নিজেকে আমৃত্যু কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত রাখবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেমন সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের দাবি মেটাতে আমাদের কয়জন সাহিত্যিক প্রস্তুত আছেন? এত বড় ঝুঁকি নেবার মত ক্লেশ-সহনের মনোবল কয়জনার আছে?

ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক ছোট বহরের লেখক—তাঁদের না-আছে জীবন-জিজ্ঞাসা, না-আছে বিদ্যাবুদ্ধির বল। দার্শনিকতার ধার বড় কেউ একটা ধারেন না। স্বীয় মনন ও চিন্তাকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে আত্মশুদ্ধির ক্লান্তিহীন চেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন—সে পথ আমাদের জন্য নয়। আকাশের দূরবর্তী তারা থেকে পৃথিবীর যতদূর ব্যবধান, অধ্যয়নশীলতা থেকে তাঁদের অনেকেরই প্রাত্যহিক অভ্যাসের ব্যবধান তদ্রূপ। তেতো ওষুধের মত চিন্তা-প্রবণতাকে এড়িয়ে চলতে পারলে তাঁরা আর-কিছু চান না। বলা হবে রসবুদ্ধির সঙ্গে চিন্তাশীলতা ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক তেমন নিগূঢ় নয়। তদুত্তরে বলব, এই ধারণাটা শুধু আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যেই বলবৎ, ইউরোপের অগ্রসর সাহিত্যগুলিতে কুত্রাপি এই ধারণা প্রচলিত নেই। ইউরোপীয় সাহিত্যে শুধু রস এবং দার্শনিকতার সমাহারেই কাব্য এবং সাহিত্য শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও দেখতে পাই রস

এবং জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠতার সংস্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। শুধু একেবারে হাল আমলে এসেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সাহিত্য থেকে তত্ত্ববোধ নীতিবোধ সত্যান্বেষণস্পৃহা প্রভৃতি সদ্‌লক্ষণগুলিকে অবান্তর জ্ঞানে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছি। যেন তথাকথিত সৌন্দর্যচর্চাই সব, সাহিত্যের উপর আর-কিছুর দাবি থাকতে নেই। সত্য ও কল্যাণ-ভাবনাবিরহিত এই অসার সৌন্দর্যায়নের জন্যই আজ সমকালীন বাংলা-সাহিত্যে তরল মানসিকতার এতদূর প্রসার।

তরল মানসিকতার কার্যকরী প্রমাণ দেওয়া কঠিন নয়। বহু উদীয়মান লেখকের লেখা পড়ে মুগ্ধ হই, তাঁদের গল্প-কবিতায় শক্তি-মত্তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত বোধ করি। তারপর তাঁদের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গিয়ে নিরাশ হই। দেখা যায়, তাঁদের রচনায় শক্তিমত্তার যেটুকু পরিচয় পরিস্ফুট ততটুকুই তাঁদের শক্তির সীমা—এ শক্তি ব্যক্তিত্ব-চর্চার ফলে নয়, এ শক্তি সহজাত প্রেরণার বশে পাওয়া। এবং ঠিক এই শেষোক্ত কারণে এ শক্তির আয়ুষ্কালও স্বল্প। কেন-না, যে শক্তি আমরা অনুশীলনের দ্বারা লাভ করি নি, বাইবেলোক্ত অন্তরীক্ষ-চ্যুত 'ম্যান্না'র মত পড়ে-পাওয়া বস্তুরূপে লাভ করেছি, তাকে আমরা দীর্ঘকাল ধারণ করে রাখতে পারি না। এক সময়ে না এক সময়ে সে আমাদের মুঠি গলে বেরিয়ে যাবেই। শিল্পে হোক সাহিত্যে হোক অন্য যে-কোন কর্মক্ষেত্রে হোক, শক্তিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে হলে অনলস শ্রমের পথেই সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে—অশিক্ষিত-পটুত্বের পথে কে কবে শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করতে পেরেছেন?

একটা কথা এই প্রসঙ্গে সকলকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে বলি। শক্তির সঞ্চয় এবং শক্তির অভিব্যক্তি কোন সময় তুল্যমূল্য হওয়া উচিত নয়। হলে বিপত্তি অনিবার্য। ক্ষোভের বিষয়, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের লেখকদের অধিকাংশেরই মানসিক গঠনের মধ্যে

এ-জাতীয় অপূর্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্ব মনকে টানে না, উল্টো, আত্মীয়তাস্পৃহাকে প্রতিহত করে। রচনায় উৎকর্ষ-চিহ্নের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তা যদি সমগ্র ব্যক্তিত্বের আংশিক ফলস্বরূপ হয়, সে ক্ষেত্রেই শুধু রচয়িতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু দুয়ের ভিতর আঙ্কিক সমীকরণের অতিরিক্ত সম্পর্ক কিছু না থাকলে মন তখনই দমে যায়। কোন লেখকের রচনা পড়ে মোটামুটি ভাল লাগে অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বে মন তেমন আকৃষ্ট হয় না—এই আপাত-অসঙ্গতির হেতু বোধ করি এই যে, রচনার কাজ-চালানো-গোছের উৎকর্ষ-বিধানের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট লেখকের শক্তির সঞ্চয় নিঃশেষিত, তার বাড়া পুঁজি তাঁর নেই। আমি পূর্বেই বলেছি, আত্ম-প্রকাশের বিরামহীন প্রচেষ্টায় নিরন্তর নিয়োজিত থাকলে ব্যক্তিত্বের শুধু যে প্রসার ঘটে তা-ই নয়, তার গুণগত রূপান্তরও ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই গুণগত রূপান্তরের তত্ত্বটি আমাদের ভাল জানা নেই বলেই বোধ হয় আমরা দৈবানুগ্রহরূপে যে শক্তি লাভ করি তাতেই সন্তুষ্ট থাকি—সে শক্তির অনুশীলনের কথা ভাবি না।

শক্তির অনুশীলন বলতে এখানে কারখানায় উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণের হারে বইয়ের পর বই লেখা বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে না প্রকাশকদের কাছ থেকে শ্রমের কড়ি আদায় করে আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ স্তূপীকৃত করে তোলা,—পাঠকসাধারণের কাছ থেকে উত্তরোত্তর সমাদর লাভের সামর্থ্য ও ভাগ্যও এর দ্বারা বোঝাচ্ছে না ; বোঝাচ্ছে ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার-পর্যালোচনার দ্বারা স্বীয় শিল্পী ও অন্যবিধ ব্যক্তিত্বকে সংশোধিত সম্মার্জিত ক্রমোন্নত করে তোলা। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা এ-জাতীয় শুদ্ধিপ্রয়াসের অপরিহার্য প্রাথমিক সর্ত, আত্মপ্রসাদবোধ এ প্রয়াসের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বঙ্কিমচন্দ্র-মুখ্য ঊনবিংশ শতকের লেখকদের মধ্যে এ জিনিস আমরা

প্রত্যক্ষ করেছি, এ শতাব্দীর পরিধির ভিতর রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় আত্মোপলব্ধি-প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঋষি টলস্টয়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্বতঃই সব আগে মনে পড়া উচিত। কিন্তু এখনকার সাহিত্যে এই ধরণের সর্বাত্মক ব্যক্তিত্বচর্চার সংস্কার প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। ফলে সাহিত্য কতকগুলি তরল মনোভাবাপন্ন চটুলবুদ্ধি সাহিত্য ব্যবসায়ীর মজলিশী আসরে পরিণত হয়েছে—সত্যকার জ্ঞানী-গুণীরা এই আসরে প্রবেশ করতে স্বভাবের সঙ্কোচ বোধ করেন। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক স্বধর্মনিষ্ঠ সাহিত্যব্রতী তাঁদের স্বরচিত অভিমানের দুর্গে সদা আত্মগোপন করে আছেন, ভিড়ের দঙ্গলের মধ্যে তাঁদের মুখ কদাচ দেখা যায়।

আরও একটি কথা ব্যক্তিত্বচর্চার প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কেউ কেউ রচনার ভিতর ভাষার অনাড়ষ্টতা ও সহজ প্রবহমানতার প্রমাণ পেলে আশু উল্লসিত হয়ে ওঠেন। যেন ভাষার অনায়াস স্বচ্ছন্দতাটাই সব, স্ফটিকস্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা সব-সেরা জিনিস। দেখতে হবে কী জাতীয় বিষয় বা ভাবকে আশ্রয় করে ভাষা তার এই স্বচ্ছন্দ গতিবেগ তথা প্রাঞ্জলতা-গুণ লাভ করেছে। রচনার উপজীব্য বিষয় যদি তরল হয়, রচয়িতার মনোগত ভাব যদি স্বভাবতঃই অগভীর হয়, তবে রচনায় স্বচ্ছন্দতা বা প্রাঞ্জলতাগুণের অবতারণা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এ কাজ সম্পাদনে মামুলী সাহিত্যবুদ্ধির অতিরিক্ত কিছু দরকার হয় না। সাধারণ মাপের ভাষা-কুশলতা যাঁরই আয়ত্ত আছে তিনিই এ কাজ পারেন। কিন্তু লেখকের চরম পরীক্ষা গভীর-ভাব দুরূহ-ভাব বিশুদ্ধ-ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করার সামর্থ্যে। এই মানদণ্ডেই মুখ্যতঃ লেখকের শক্তিমত্তার বিচার হওয়া উচিত, এবং এই বিচার-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শুধু লেখকের ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিমাপ হওয়া সম্ভব। গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা কল্পনা অনুভূতি যিনি যত সহজে প্রকাশ করতে পারেন,

বুঝতে হবে তাঁর ব্যাক্তত্বের জীবন তত অধিক মাত্রায় সংসাধিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বকে নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বকযন্ত্রে পরিস্রুত করতে করতে এমন এক স্তরে নিয়ে আসা যায়, যেখানে মন একবার স্থিত হলে অতি গভীর-ভাবও লেখনীমুখে সাবলীলতামণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচিত সঙ্গীতের বাণী-অংশ। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনায় গড়ে-তোলা রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যময় উত্তুঙ্গ প্রাকার এই গানগুলির মাধ্যমে শীর্ষবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের সৌরভ গানগুলির ভিতর চারিয়ে আছে। এইরূপ, যে কোন শিল্পকর্মে আমরা গভীরকে সহজ করে পেয়েছি সেখানে শিল্পীর মহত্তম ব্যক্তিত্বময় রূপ প্রকটিত হয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ রূপের মুখোমুখি হওয়া দেবতা-সন্দর্শনের মত বিরল ভাগ্যের দ্যোতক। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক দুই-চারিজন লেখকের ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিত্বচর্চার সংস্কার ও অভ্যাস লোপ পেতে বসেছে। ফলে সাধারণ ভাগ্যের উপর বরাত দিয়ে মোটামুটি অবস্থায় তৃপ্ত থাকাটাই আমাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগের পর নূতন শুভলগ্নের আবির্ভাব হতে বোধ হয় এখনও অনেক বিলম্ব।

॥ সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ॥

পূর্ববর্তী নিবন্ধে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-সাধনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান নিবন্ধে শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব আর শিল্পিব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় পার্থক্য সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিচার রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষের দ্বারা নিরূপিত হওয়া উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এ কালের সমাজ-ব্যবস্থাটাই এমন যে, সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে কদাচিৎ এই বিশুদ্ধ মানদণ্ডের প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রায়ই সাহিত্য বিচার করতে বসে আমরা সাহিত্যবিচারের সঙ্গে দু-পাঁচটা অবান্তর প্রসঙ্গেরও বিচার করে বসি। এমন প্রসঙ্গ, যার অনুপ্রবেশ সাহিত্যবিচারকর্মের মধ্যে কোনক্রমেই ঘটা উচিত নয়, অথচ তা আমরা ঘটতে দিই। যেমন, সাহিত্যকর্মের মূল্য নিরূপণের বেলায় সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক পদস্থ ব্যক্তি কি না, কর্মঠ ব্যক্তি কি না, : বিচার নিতান্ত অনাবশ্যক। লেখা যদি ভাল হয় তাকে প্রাণ ভরে প্রশংসা করব, ভাল না হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করব—এই আমরা বুঝি। এর মধ্যে লেখকের সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ধনাঢ্যতা অথবা ধনহীনতা, ভালত্ব অথবা মন্দত্ব ইত্যাদি প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। অথচ জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, এ-জাতীয় ভ্রম আমরা প্রায়শঃ করে থাকি। ফলে আমাদের সমালোচনাক্রিয়া নিখুঁত হয় না—প্রায়ই কোন-না-কোন অবান্তর প্রসঙ্গের কলুষস্পর্শে তার জাত যায়। আমাদের যেটি লক্ষ্য তার মধ্যে বারেবারেই যদি অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা ঘটতে থাকে তা হলে

সমস্ত প্রক্রিয়াটিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চিন্তাহীনতা বরং ভাল, তবু গুলিয়ে-যাওয়া চিন্তাপ্রণালীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

একজন সাহিত্যিক কর্মজীবনে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সুনাম অর্জন করতে পারেন কিংবা ব্যক্তিজীবনে সজ্জন অমায়িক সদালাপী হতে পারেন—হওয়াই বাঞ্ছনীয়—, তা বলে তাঁর রচনার বিচার-প্রক্রিয়ার ভিতর ওই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা প্রশস্ত নয়। তাতে পদে পদে বিচারবুদ্ধি-বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা। হয়তো শিল্পীর চারিত্রিক উৎকর্ষের সঙ্গে রচনার উৎকর্ষের কোথাও সূক্ষ্ম একটা যোগ আছে, কিন্তু সে যোগাযোগের তত্ত্বকে একটা সরল নিয়ম হিসাবে বোধ হয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না। তা যদি হত, তা হলে বিশ্বসাহিত্যের অনেকানেক শ্রেষ্ঠ রচনা ওই নিয়মের কষ্টিপাথরে বাতিল হয়ে যেত। সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, ব্যক্তির ভালত্ব অথবা মন্দত্বের সঙ্গে রচনার ভালত্ব অথবা মন্দত্বের দৃশ্যতঃ কোন যোগ থাকে না। কাজেই চারিত্রিক ভালত্বের সঙ্গে রচনার ভালত্বের কার্য-কারণ সম্বন্ধসূত্র টানতে গেলে সমালোচনা-ক্রিয়ায় বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। ব্যক্তির ভালত্ব অথবা মন্দত্ব নানা সামাজিক কার্য-কারণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়—গৃহের পরিবেশ এবং পরিপার্শ্বের প্রভাব এই ক্ষেত্রে মস্ত একটি বিচার্য বিষয়। এর সঙ্গে রচনাকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষের আবশ্যিক কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি ভালই হোন আর মন্দই হোন, তিনি যখন রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হন তাঁর ব্যক্তিত্ব নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তখন শিল্পী; সৃষ্টির আবেগে তাঁর মন পূর্ণ। তদবস্থায় শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব নিতান্ত পশ্চাদ্‌ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব এক নয়। শিল্পবিচার করতে গিয়ে এ দুয়ের সমীকরণ করবার যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা অজ্ঞাতসারে ভুলের ফাঁদে পা দেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস থেকে দু-একটি নজির উপস্থিত

করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভ্স্কির কথা ধরা যাক। ডস্টয়েভ্স্কির চরিত্রে এমন কতিপয় বিচ্যুতি ছিল যা আমাদের মনকে আঘাত করে, আমাদের শুচিতাবোধকে পীড়িত করে। কিন্তু এটি হল শিল্পনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের পরিমাপ-প্রয়াস—এর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নিতান্ত ক্ষীণ সূতায় ঝুলে আছে বা নেই বললেই চলে। শিল্পী হিসাবে ডস্টয়েভ্স্কির কল্পনা-শক্তির তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য শেক্স্পীয়রের প্রতিভার সমগোত্র। কই, শিল্পরাজ্যে তো তাঁর ব্যক্তিজীবনের এতটুকু ছায়াপাত হতে আমরা দেখি না। এই অসঙ্গতির কারণ কী? কারণ—যে কথা এইমাত্র বলেছি—শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দ্বিমুখীনতা। মানুষের সামাজিক সত্তা আর শিল্পিসত্তার মধ্যে বোধ হয় আবশ্যিক কোন যোগ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বেলায় অর্থাৎ সমাজজীবনের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বভাব নানা কারণে দুমড়ে মুচড়ে যেতে পারে, তাঁর মনোবৃত্তির বিকার ঘটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই বিকার সামাজিক সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের এলাকা ছাড়িয়ে তা নির্বিশেষ মানুষের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। শিল্পীর জগৎ নির্বিশেষ মানুষের জগৎ। সেখানে যে মানুষ নিয়ে শিল্পীর কারবার তার উপর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধূলি কালি মাখানো থাকে না, সে-কারণ সে মানুষের শিল্প-রূপায়ণে শিল্পী তাঁর সবটুকু কৃতিত্ব প্রয়োগ করবার অবকাশ পান। শিল্পসৌন্দর্যের মূল উৎসও বোধ হয় এইখানে। শিল্পীর চিত্রিত মানুষ সার্বভৌম মানুষ, সার্বকালীন মানুষ—বিশেষ স্থান-কালের দ্বারা তাকে গণ্ডীবদ্ধ করা চলে না। বিশেষ স্থান-কালের দ্বারা কাব্যো-পন্যাসাদির চরিত্রগুলির বহিরঙ্গকে শুধু চিহ্নিত করা চলে; তাদের মনোরাজ্যে সার্বভৌম আদর্শের অধিষ্ঠান।

কিংবা ধরা যাক ফরাসী রিয়ালিস্ট ঘরানার লেখকগণ—স্তেঁধল, ফ্লবেয়র, ব্যলজাক, জোলা, মোপাসাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যশিল্পীদের ব্যক্তিজীবন অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁদের জীবন সমসাময়িক কালের প্রবহমান দোষত্রুটি মুক্ত নয়। বহু বহু মানুষের আচরিত যে সামাজিক কুঅভ্যাস, তার প্রভাব অতিক্রম করা বড় সহজ নয়। সমাজের অতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জীবনও সে প্রভাবের বশ হতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, উল্লিখিত শক্তিশালী লেখকদের জীবনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু তাঁদের এই ব্যক্তিজীবনের অপূর্ণতা তাঁদের ব্যক্তিজীবনের স্তরেই মোটামুটি আবদ্ধ ছিল বললে অসত্য বলা হয় না। এমন নয় যে তাঁদের সাহিত্যে তাঁদের আচরিত জীবনযাত্রার ক্লেদ কিছু পরিমাণে উপছে পড়ে নি, কিন্তু সব জড়িয়ে বলা যায়, তাঁরা মোটামুটি সকলেই পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজ ফুটিয়ে তোলবার সাধনাই করেছেন। মোপাসাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পরূপে পরিগণিত।

কোন কোন ধর্মাদর্শের অনুরাগী সমালোচক উল্লিখিত ফরাসী বাস্তবপন্থী লেখকদের রচনার মধ্যে ধর্মবোধের অভাব লক্ষ্য করে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এঁদের জড়বাদী মনোভাবই এঁদের সাহিত্যের অতিরিক্ত বাস্তবগন্ধিতার কারণ। প্রধানতঃ রোমান-ক্যাথলিক সাহিত্যিক মহল থেকেই এ-জাতীয় অভিযোগ করা হয়ে থাকে। এই অভিযোগের মূলে পূর্ণ সত্য না-ও থাকতে পারে। লেখকের ধর্মবিশ্বাস (অথবা ধর্মে অবিশ্বাস)-এর সঙ্গে তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির যোগ থাকবেই এমন কোন কথা নেই। গভীর ধর্মবিশ্বাসী হয়েও একজন লেখক রচনাদর্শের দিক দিয়ে নিতান্ত বাস্তবঘেঁষা ও দেহবাদী হতে পারেন। একালের একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক আঁদ্রে জিদ আক্ষরিক অর্থে ঠিক ধর্মবিশ্বাসী হয়তো ছিলেন না, কিন্তু গভীর

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসায় তাঁর রচনাবলী পূর্ণ। কিন্তু দেখা যায় তাঁর রচনায় দেহবাদের আত্যন্তিক প্রাধান্য। যৌন-মনস্কতা তাঁর উপন্যাসের আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে আছে। অন্যদিকে, স্বভাবতঃ আজ্ঞেয়বাদী একজন লেখকের পক্ষে স্বীয় রচনার ধারার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক আকুতি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, যদি তাঁর যথার্থ শিল্পদৃষ্টি ও কল্পনার ক্ষমতা থাকে। আনাতোল ফ্রাঁস-এর রচনাবলী শেষোক্ত কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 'Thais' ও 'The Red Lily' উপন্যাস সৌন্দর্যসৃষ্টির দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ যুগের রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী লেখকগণ যত বড় দক্ষ শিল্পীই হোন আনাতোল ফ্রাঁস কিংবা মোপাসাঁর সঙ্গে বোধ করি তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য তুলনীয় নয়। অন্যপক্ষে ডস্টয়েভ্স্কি ব্যক্তিজীবনে বিমর্ষ চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তাঁর উপন্যাসগুলির ভিতর শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন। সুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাস এবং সত্য ন্যায় ও সারল্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাসগুলির ভিতর ওতপ্রোত হয়ে আছে। 'The Brothers Karamazov' একজন অভ্যস্ত দ্যূতক্রীড়াসক্ত লেখকের লেখা বিশ্বাস করাও কঠিন।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তই বোধ হয় অপরিহার্য যে, কোন্ কোন্ কার্য-কারণের সূত্রে লেখকের রচনার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরে থেকে তা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। সমালোচকদের পক্ষে এ-জাতীয় প্রয়াস প্রায়ই বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়। লেখকের দৃশ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে লেখকের অদৃশ্য মনোলীলার যোগ খুব নিগূঢ় নয়। লেখকের ব্যক্তিত্বের যেটি বহিরঙ্গ অর্থাৎ সামাজিক ব্যক্তিত্ব তার চলা ও বলা দশজনকে নিয়ে; কিন্তু লেখকের শিল্পিব্যক্তিত্ব নিঃসঙ্গ একক নিভৃতিচারী। সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির ভাবনা চিন্তা আকাঙ্ক্ষা বাসনার অণু-ভগ্নাংশেরও সংবাদ আমরা রাখি না। আসলে শিল্পী মাত্রই অন্তরে অন্তরে সমাজ-

নিরপেক্ষ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ একক কিন্তু চিরকালীন মানুষ। স্থান-কালের সঙ্কীর্ণ ধারণার দ্বারা তাঁর কল্পনাকে বাঁধা যায় না। সার্বভৌম তথা সার্বকালিক মন বলে একটি বস্তু আছে। শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-প্রেরণার জন্য এই মনের দুয়ারেই সাধারণতঃ হাত পাতেন। তাঁদের রচনায় সমসাময়িক কাল পরিবেশ ও মানুষের যে চিত্র দেখি, সেটা রচনার বহির্বিন্যাস মাত্র; তাঁদের শিল্পদৃষ্টির মূল আরও অনেক গভীরে প্রোথিত। কাজেই বহির্ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে যাঁরা শিল্পীকে বিচার করেন তাঁরা শিল্পীর শিল্পরহস্যের সামান্যই উন্মোচন করতে সমর্থ হন।

এই কারণে দেখতে পাই, সমালোচকদের মধ্যে বিশিষ্ট এক শ্রেণীর বিচারক আছেন যাঁরা শিল্পকর্মের মূল্যায়নে শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিল্পীর শিল্পব্যক্তিত্বকে সমীকৃত করতে নারাজ। শুধু তাই নয়, শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে তাঁরা শিল্পবিচারের আওতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত রাখবার পক্ষপাতী। একটি শিল্পকর্ম নিছক শিল্পকর্ম হিসাবেই বিবেচ্য। কে তার রচয়িতা, কী তাঁর পদমর্যাদা, কোন্ সামাজিক স্তর থেকে তিনি উদ্ভূত হয়েছেন, কেমন তাঁর ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস— এ সকল প্রসঙ্গের বিচার তৎপক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। শিল্পীর নামধাম গাঁই গোত্র ইয়াঙ্কীসুলভ সংবাদক্ষুধার্ত পাঠকের নিকট অপরিহার্য মনে হতে পারে, কিন্তু রসিক পাঠকের নিকট এ সকল তথ্যের মূল্য কানাকড়িও নয়। তিনি শুধু রচনাটিকে রচনা হিসাবে বিচার করেই পরিতৃপ্ত ও ক্ষান্ত। এমনকি এতৎপক্ষে সেই শিল্পীর পূর্ব পূর্ব রচনার সহিত বর্তমান রচনাকর্মের তুলনামূলক বিচারও অল্পবিস্তর অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে পরিত্যাজ্য।

আমাদের সাহিত্যে এই ধারার সমালোচনা খুব কমই হয়েছে বলা চলে। বরং ঝোঁকটুকু যেন বিপরীত প্রান্তে নিবদ্ধ। লেখকের রচনার

মূল্য বিচারে লেখকের ব্যক্তিত্বের বিচার প্রায়শঃ অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে। বামপন্থী সমালোচকগণ লেখকের শ্রেণীসত্তার বিচারবিরহিত আলোচনায় আদৌ অভ্যস্ত নন। লেখকের শ্রেণীস্বরূপের বিচার বাদ দিয়ে তাঁরা রচনার বিচারের কথা ভাবতে পারেন না। তবে শুধু যে তাঁরাই এ অভ্যাসের অধীন তা-ই নয়, অন্যান্য গোষ্ঠীর সমালোচকদের মধ্যেও এ অভ্যাসের পোষকতা দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের রচনার ভঙ্গিতেই যা পার্থক্য, নইলে বিচারপ্রণালী প্রায় এক। প্রবণতাভেদে কেউ লেখকের শ্রেণীসত্তাকে বড় করে তুলে ধরেন, কেউ সামাজিক পদস্থতা এবং ধনাঢ্যতা (অথবা তদভাব)-কে বিচার্য বিষয়ের কোঠায় ফেলেন। কারও কারও নিকট আবার লেখকদের ইংরেজিয়ানা একটা মস্ত বড় গণনীয় বিষয়। তাঁরা রচনার মূল্যায়নে রচয়িতার পাশ্চাত্ত্যমুখীনতাকে একটি বিশেষ অনুকূল বিষয় বলে মনে করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট রচয়িতার জীবনযাপনপ্রণালীতে কিঞ্চিৎ বিলিতিয়ানার গন্ধ থাকলে নির্বাচনী রায় তদনুকূলে ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা বারো-আনা অবধারিত। বাকী চার-আনা সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় যদি লেখক কোন গতিকে একবার ইউরোপ কিংবা আমেরিকা ঘুরে আসতে পারেন। কোন কোন পক্ষ লেখকের সাহেবিয়ানাকে তাঁর শক্তিমত্তার অতিরিক্ত নিদর্শন জ্ঞান করে তৃপ্তি লাভ করেন।

স্পষ্টতঃই এ সকল মানদণ্ড শিল্পবিচারে নিতান্ত অগ্রাহ্য। এ-জাতীয় বিচারের দ্বারা আর যা-ই সম্পাদন করা সম্ভব হোক-না কেন, শিল্পের প্রকৃত বিচারক্রিয়া সম্পাদন করা যায় না। রসবিচারের মাপকাঠি এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষোভ এই যে, এই ভিন্নতার চেতনা আমাদের সাহিত্যে প্রবল নয়। শুধু যে সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা বিচারক্রিয়াকে কলুষিত করেন তা-ই নয়,

অনেক সময় অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এ-জাতীয় বিভ্রমের বশীভূত হতে দেখা যায়। তাঁরা সাহিত্যিকের মূল্য নিরূপণে তাঁর সাহিত্যকৃতিকে যত-না মর্যাদা দেন তার চাইতে বেশী মর্যাদা দেন তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে, আর্থিক কৌলীন্যকে। আর্থিক কৌলীন্য এবং সামাজিক প্রতিপত্তি কোনরূপ মর্যাদার যোগ্য নয় এমন কথা বলি না, কিন্তু তার ক্ষেত্র আছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান ক্ষমতাবান ধনবান ব্যক্তি দশের কাছ থেকে মর্যাদা লাভ করুন তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই, এমনকি অপকৃষ্ট লেখক তাঁর ধনকৌলীন্যের সুবাদে যদি সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রগুলিতে (যথা উৎসব-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি) বিশেষ সুবিধা ও অধিকার দাবি করেন নীতি হিসাবে তার প্রতিকূলতা করলেও আপাতত সে মনোভাব বোঝাও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু যেখানে সাহিত্য-বিচারটাই মুখ্য, সেস্থলে এ-জাতীয় অবান্তর প্রসঙ্গের বিচার শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। এর দ্বারা সাহিত্যের অগ্রগতি বিশেষভাবেই ব্যাহত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রতিবাদীরা হয়তো বলবেন, ব্যক্তিত্বের বিচারবিরহিত সাহিত্যের বিচার আদর্শের ঘোষণা হিসাবে অতিশয় সুন্দর, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ-জাতীয় abstraction সম্ভব কি না তা ভেবে দেখবার মত। এর উত্তর এই যে, আদর্শ সব সময়ই দুরূহ ও দুরধিগম্য। আদর্শের এই দুরধিগম্যতার নজিরে তার সারবত্তা নাকচ হয়ে যায় না। আদর্শ লক্ষ্যের বেলায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি কদাচ আয়ত্ত হওয়ার নয়, তা বলে তদুদ্দেশ্যাভি-মুখী নিরন্তর ও নিরলস চেষ্টায় দোষ নেই। সেই চেষ্টাটাই যেন অনুপস্থিত। সাহিত্যের রসবিচার যদি আমাদের মূল অভীষ্ট হয়, তা হলে সেই কঠিন চেষ্টার উদ্যম ও ঝুঁকি স্বীকার করতে আমাদের আদৌ পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়।

॥ সাধু ও চলিত-ভাষার দ্বন্দ্ব ॥

বর্তমান নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব—ভাষা সমস্যা। সাধু-ভাষা বনাম চলিত-ভাষার সমস্যা বাংলা-সাহিত্যে নূতন সমস্যা নয়, তবু আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আর একবার যাচাই করে নিতে চাই।

অদ্যকার অধিকাংশ বাঙালী লেখক তাঁদের চিন্তা ও কল্পনা চলিত-ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ করে থাকেন, এটি দেখতে পাই। শুধু যে সাহিত্যের নিজস্ব পরিসরের মধ্যেই চলিত-ভাষার এই আধিপত্য বর্তমান তা-ই নয়; সাহিত্যেতর বিষয়, যথা—দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি ইতিহাস ইত্যাদি ঘটিত আলোচনায়ও চলিত-ভাষা সাধু-ভাষার উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সাধু-ভাষার গঠনরীতির উপর যে সব লেখকের দখল অপ্রতিবাদ্য, তাঁরাও দেখি আজকাল যুগপ্রভাবের বশে স্বকীয় অধিকারের ক্ষেত্র ত্যাগ করে অনিশ্চিত অধিকারের সীমায় প্রবেশ করে নিজেদের আধুনিকতা প্রমাণ করতে চাইছেন। এ থেকে এইরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, মনোভাব প্রকাশে সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার আপেক্ষিক যোগ্যতার প্রশ্নে আজ আর চলিত-ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই; সকলেই বিনা প্রতিবাদে ধরে নিয়েছেন যে, সাধু-ভাষা হল বাংলা-গদ্যের পুরাতন বাতিল রূপ, পক্ষান্তরে গদ্যের চলিত বা কথ্য রূপটাই হল আধুনিক জীবনোচিত চিন্তন-মনন প্রকাশের একমাত্র উপযুক্ত বাহন।

কিন্তু সত্যই কি তাই? সত্যই কি চলিত-ভাষার সমধিক উপযোগিতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয়েছে? আমাদের তা মনে

হয় না। জানি, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (চৌধুরী মহাশয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া *হল, তার কারণ তিনিই এ-যুগে বাংলা-সাহিত্যে চলিত-ভাষারীতি আন্দোলনের মুখ্য প্রবর্তক) মত প্রধানগণ চলিত-ভাষার অনুকূলে* তাঁদের দ্বিধাহীন রায় জারি করেছেন, তবু মামলাটির এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। চলিত-ভাষার সপক্ষে যদি অনেক কথা বলার থাকে, তা হলে সাধু-ভাষার পক্ষেও অনেক বলবার কথা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যপক্ষে, উক্ত রথিচতুষ্টয়ের সোৎসাহ পোষকতা সত্ত্বেও চলিত-ভাষারীতির বিরুদ্ধে লম্বা একটি অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অন্ততঃ, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে যে-জাতীয় চলতি ভঙ্গির ব্যাপক প্রয়োগ চলেছে তার বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত ভাবেই পর্বতপ্রমাণ যুক্তি স্তূপীকৃত করে তোলা যেতে পারে।

মুশকিল হয়েছে এই যে, যিনি যে পক্ষের অনুকূলে যুক্তিজাল বিস্তার করবার চেষ্টা করেন, আপাতত তাঁর দৃষ্টি সেই পক্ষের উপরই বিনিঃশেষে নিবদ্ধ থাকে, অন্য পক্ষের অনুকূলেও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে সেটি তাঁর দৃষ্টি প্রায়শঃ এড়িয়ে যায়। এই-যে একচক্ষুহরিণসুলভ খণ্ডিত দৃষ্টির দুর্বলতা, এ দুর্বলতা থেকে সম্ভবতঃ আমাদের সাহিত্যের প্রধানগণও সব সময় মুক্ত নন। এ-জাতীয় একদেশদর্শী রীতি আদালত-গৃহে বিবদমান দুই পক্ষের ব্যবহারজীবীর গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার এ পদ্ধতি নয়, তা বলা প্রয়োজন। যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে বিতর্কাধীন দুই বস্তুর ভালমন্দ বিচার করে তারপর এক পক্ষের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে সুস্থির রীতি, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার চাইতে কার্যকরী প্রক্রিয়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তেমন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের উৎসাহ কম। প্রায়শঃ আমাদের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়

পূর্বাহ্নের নিরূপিত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা; যুক্তির আলোকে ভাল-মন্দ বাছাইয়ের ব্যাপারে আমাদের শৈথিল্য সুপ্রকট। আমরা এখনও ঈশপের গল্পের সেই সনাতন রীতিতেই কম-বেশী বিশ্বাসী, যে রীতিতে *সিংহ মূর্তিশিল্পে সব সময় মানুষের পায়ের তলায় প্রক্ষিপ্ত; সাধু*-ভাষাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হলে গোড়ায় তাকে বদনাম দিয়ে ঝোলানোর চাইতে সহজ কাজ আর কী হতে পারে!

এমন কথা বলব না, চলিত রীতিতে বাংলা-গদ্যের গভীর রূপটি পরিস্ফুট করে তোলা সম্ভব নয়। সে রকম কোন অপরিবর্তনীয় ধারণা যদি লেখকের থাকত, তা হলে এই নিবন্ধ চলিত-ভাষায় রচিত হবার পক্ষে কোনই যুক্তি থাকত না। ব্যাপারটি তাজ্জব হলেও সত্য যে, এই নিবন্ধে সাধু-ভাষার পোষকতা করা হয়েছে, অথচ তা লিখিত হয়েছে চলিত-ভাষায়। এর কৈফিয়ৎ, লেখকের অভ্যাসটাই এই জন্য মূলতঃ দায়ী, সাধু-ভাষার তুলনায় চলিত-ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এই অভ্যাসের সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়। হতে পারে চলিত-ভাষা বহুব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা একদিন সব দিক দিয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠবে, এমন কি সাধু-ভাষার প্রচলিত রূপের সুষমা ও সৌন্দর্যকেও তার পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখনও বহু—বহু দূরে। চলিত-ভাষার আকাঙ্ক্ষিত রূপ এখনও দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; সেই দূর-সম্ভাবনাকে 'fait accompli' মনে করে এখনই সাধু-ভাষার সঙ্গে তাল ঠোকার কোন অর্থ হয় না। বর্তমান প্রচলিত সাধু ও চলিত-ভাষার ধরণ-ধারণ পাশাপাশি বিচার করলে এ কথা নিঃসন্দেহেই স্বীকার করতে হয় যে, সাধু-ভাষা চলিত-ভাষার তুলনায় বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ শুধু এই নয় যে, সাধু-ভাষার ঐতিহ্যের পিছনে গত দেড় শত বৎসরের অভিজ্ঞ লেখকদের অনুশীলনের সমর্থন আছে; এর কারণ এও বটে যে, সাধু-ভাষার অভ্যস্ত

ভঙ্গিমার মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণ আছে যা অর্বাচীন চলিত-ভাষায় প্রায়শঃ অনুপস্থিত। এই গাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জলতা আয়ত্ত করতে চলিত-ভাষাকে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

চলিত-ভাষাকে যুগধর্মের প্রভাববশে যদি সর্বস্বীকৃত মর্যাদা দিতে হয়, তা হলে সর্বপ্রথমে চলিত-ভাষার বদ্ধমূল অপূর্ণতাগুলি স্বীকার করে নিয়ে সাধু-ভাষার দৃষ্টান্তের আলোকে তাকে সুগঠিত করা দরকার। উপরন্তু, চলিত-ভাষায় হাত দেবার আগে কিছুকাল একাগ্র নিষ্ঠায় সাধু-ভাষা মক্স করা দরকার। সাধু-ভাষার পদ্ধতি-প্রকরণ ভালমতে আয়ত্ত হলে তবেই শুধু চলিত-ভাষায় অধিকারলাভ সম্ভব। ভাল গদ্য-কবিতা লিখতে হলে যেমন প্রথম বহুকাল মিলের কবিতায় হাত পাকাতে হয়, তেমনি চলিত-ভাষায় রচনার স্ফূর্তি আনতে হলে সর্বপ্রথমে বাংলা সাধু-ভাষার স্বীকৃত রূপটিকে বিধিমতে আয়ত্ত করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল হয়েছে সব উল্টো। মাতৃজঠর থেকে ভূপতিত হয়েই কবিরা সব গদ্য-কবিতায় হাত পাকাতে শুরু করেন, গদ্য-লেখকেরা বীরবলী-ধরনে বুকনি কাটতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ কুড়ি বৎসরের গদ্যরচনা মূলতঃ চলিত-ভাষায় লিখিত—এই নজিরটিকে আজকাল খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী সাহিত্যজীবনে তিনি যে একটানা পঁয়তাল্লিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সাধু-ভাষার চর্চা করেছেন, এবং উৎকর্ষলক্ষণের দিক দিয়ে তাঁর ওই গদ্যের সঙ্গে যে শেষ বয়সের গদ্যের কোন তুলনা হয় না—এই অকাট্য তথ্যটিকে অসুবিধার কারণেই প্রায়শঃ চেপে যাওয়া হয় বলে মনে হয়। উত্তর-রবীন্দ্র-অনুরাগীদের প্রীতিকর না হলেও এ কথা বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিংবা 'জীবন-স্মৃতি'র গদ্যের পাশে 'শেষের কবিতা' কিংবা শেষ বয়সের প্রবন্ধাবলীর গদ্যের ভাষা নিতান্ত নিষ্প্রভ। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'-এর দৃষ্টান্ত- প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে চলিত

ভঙ্গির দিকে বিশেষ ভাবেই ঝুঁকেছিলেন সন্দেহ নেই, তবে এই পক্ষপাত অবিমিশ্র শুভ ফলের কারক হয় নি। বক্তব্যের স্বতঃস্ফূর্তি বিধানের চেষ্টায় শেষ বয়সের গদ্যে এমন একটা অবিন্যস্ততার ছাপ পড়েছে যা প্রথম বয়সের রচনায় তিনি নিশ্চয় বরদাস্ত করতে পারতেন না। চলিত রূপাশ্রয়ী শেষ বয়সের রবীন্দ্র-গদ্য ভঙ্গিপ্রধান, ভাষণবহুল, মুদ্রাদোষলাঞ্ছিত, এবং বিশেষ ভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কথ্যভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। এ ভাষা সরস পত্ররচনার পক্ষে উপযোগী, হালকা মেজাজের নিবন্ধ রচনার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু ভাবগম্ভীর বিষয়-আলোচনার উপযোগী কি না তাতে সন্দেহ আছে। চিন্তার গভীর-গম্ভীর অথচ প্রাঞ্জল রূপটি ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আত্মশক্তি', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ-সমূহের ভাষা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ—এ কথা বললে লেখক আজকের দিনে জাতে পতিত হতে পারেন, তবু কথাটা বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনাভঙ্গি এবং প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গি এ-কালীন গদ্যলেখকদের রচনারীতিকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে, এ প্রভাব সে রচনারীতির ভিতর বিশেষ এক ধরনের mannerism-এর জন্ম দিয়েছে। এই ম্যানারিজ্‌ম্‌-মুক্ত হতে পারলে বাংলা-গদ্যের ভাল বই মন্দ হবে না।

বাংলা সাধু-ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা সচরাচর এই একটি যুক্তি দেখান যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সাধু-ভাষা এবং চলিত-ভাষা—ভাষার এরূপ দ্বিধাকরণ নেই। একমাত্র বাংলা-গদ্যের বেলায়ই দেখা যায়, দুটি সমান্তরাল স্রোতের মত সাধু-ভাষা এবং চলিত-ভাষা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অন্যত্র যেটা নেই সেটি বাংলা-ভাষায়ও থাকা উচিত নয়, সুতরাং এ .টিকে ছাঁটাই করে অন্যটিকে ষোল-আনা প্রতিষ্ঠা দান করলে তবেই সব ল্যাঠা চোকে। আর যেহেতু

চলিত-ভাষার 'পরেই অধুনাতন অধিকাংশ লেখকের সুস্পষ্ট পক্ষপাত, সেই হেতু কোন্‌টিকে বাদ দিয়ে কোন্‌টিকে রাখতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই থাকা উচিত। প্রতিবাদীদের অগ্রনায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষাকে রূপকথার রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, "সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে"।*

পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ভাষায় গদ্যের দ্বিধাবিভাজন স্বীকৃত নয় বলে বাংলায়ও যে তা স্বীকৃত হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। বর্তমানের নৈষ্ঠিক একাচারিতার দিনে ব্যতিক্রমনিদর্শন হিসাবে বাংলা-ভাষার এই দ্বিমুখীনতাকে যদি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা যায়, তা হলে কার কি বলবার থাকতে পারে! অন্যান্য ভাষার সঙ্গে জোড় না মেলালে ঐক্য রক্ষিত হবে না, সুতরাং জোর করে জোড় মেলানো চাই—এমন মাথার দিব্য কেউ বাংলা ভাষার উপর আরোপ করে নি। আর যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে, নানাবিধ বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার বিচারে বাংলা ভাষার এই দ্বিধাগ্রস্ততার বিলোপ সাধন করা উচিত, তা হলে বলব, সেই বিলোপ-সাধনের কাল এখনও আসে নি। নিকট-ভবিষ্যতে আসবে বলেও মনে হয় না। এখনও 'বাংলাবাক্যাধীপের' হৃদয়ে সুয়োরাণী এবং দুয়োরাণী দুইয়ের-ই স্থান হওয়ার মত যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে। আগে সুয়োরাণীর প্রয়োজন নিঃশেষিত হোক, তখন দুয়োরাণীকে একলা রাজাসনে বসাবার পরিকল্পনা ধীরে সুস্থে করা যাবে।

সাধু-ভাষার সঙ্গে চলিত-ভাষার একটা প্রধান পার্থক্য তার ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। মুখের কথার রীতি অনুসরণ করে চলিত-

---

*'বাংলাভাষা-পরিচয়' : পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

ভাষায় ক্রিয়াপদকে সংকুচিত আকারে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 'যাইতেছে'-র স্থলে 'যাচ্ছে', 'করিতেছে'-র স্থলে 'করছে', বললেই যে সাধু-ভাষা চলিত-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে চলিত-ভাষার বিশেষ ঢঙটিকে প্রকাশ করে এমন নাও হতে পারে। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আরও অনেক বেশী মূলগত, এবং এই মূলগত প্রভেদের বিচারেই চলিত-ভাষা অদ্যাবধি সাধু-ভাষার নিম্নবর্তী হয়ে আছে। সাধু-ভাষার সঙ্গে চলিত-ভাষার সব চাইতে যেটি বড় পার্থক্য তা হচ্ছে, সাধু-ভাষা সংস্কৃতভাষার ভাবচেতনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত; পক্ষান্তরে আধুনিক চলিত-ভাষা সংস্কৃতের ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। পার্থক্যটির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাব অবহিত হওয়া দরকার। এবং এইটি যদি বুঝতে পারি, তা হলে চলিত-ভাষার তুলনায় সাধু-ভাষার মজ্জাগত শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

সত্য বটে, বাংলাভাষার উদ্ভব প্রাকৃত থেকে, কিন্তু শক্তিশালী পরবর্তী লেখকদের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে সংস্কৃতের রস বাংলা-ভাষার অস্থিমজ্জার ভিতর এমন গভীরভাবে প্রবেশ করেছে যে, প্রাকৃত ও সংস্কৃতে মিলে তার এক অখণ্ড যৌগিক রূপান্তর হয়েছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণজাত এই অখণ্ড ফলটিকেই আমরা নাম দিতে পারি 'সাধু-ভাষা'; যা দীর্ঘকালের অনুশীলনে ও পঠনপাঠনের অভ্যাসে একটি সংস্কারের মত দাঁড়িয়ে গেছে, আজ হঠাৎ ইচ্ছা করলেই আমরা তাকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি না। চলিত-ভাষা সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণ করছে বটে, কিন্তু যেহেতু বাংলাভাষার অভ্যস্ত প্রকাশভঙ্গি অর্থাৎ সাধুরীতির সঙ্গে তার যোগ স্থাপনের আন্তরিক কোন চেষ্টা নেই, সেই কারণে চলিত-ভাষা সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে আহৃত শব্দসম্পদ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের মনোজগতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারল না। মৌখিক বাক্যরীতির অনুসরণে

লিখিত হলেও কোথায় যেন চলিত-ভাষার ঢঙের মধ্যে একটা কৃত্রিমতা লুকিয়ে আছে, যার জন্যে তা আজও সাধু-ভাষার মত প্রাঞ্জলতা অর্জন করতে পারল না। সাধু-ভাষা মহাজন কর্তৃক 'কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা' আখ্যায় যতই কেন না ধিক্কৃত হোক, এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, সাধু-ভাষার রচনা পড়তে যত সুবোধ্য ও স্বচ্ছন্দ মনে হয় চলিত-ভাষাশ্রিত রচনা কখনও তেমন মনে হয় না। বর্তমান নিবন্ধের লেখক অভ্যাসবশে (অভ্যাসদোষেও বলা যায়) মূলতঃ চলিত ভাষাশ্রয়ী রচনাকার, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পঠনের অভিজ্ঞতায় বার বার এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, এবং সেই জন্যেই কথাটা এত জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাক্-পঞ্চান্ন রবীন্দ্রনাথ ('সবুজ পত্রে'র আমল থেকে অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষার মোড় ঘুরে গিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে) এবং শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের পাশে চলতি রীতিতে লেখা আজকের দিনের কোন উপন্যাস পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে বলে বিশ্বাস করি। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ কিংবা 'বনফুল'-এর চলিত-ভাষাশ্রিত গল্প বা উপন্যাসের তুলনায় তাঁদের রচিত সাধু-ভাষাশ্রয়ী গল্প বা উপন্যাস অনেক বেশী প্রাঞ্জলতাগুণসমৃদ্ধ, এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এ রকম হওয়ার কারণ বোধ করি এই যে, সাধু-ভাষার পিছনে দীর্ঘকালীন পঠনপাঠনের অভ্যাসপুষ্ট একটি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের প্রভাব আছে, অন্যপক্ষে চলিত-ভাষার অনুকূলে এখনও তেমন কোন সংস্কার গঠিত হয়নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো চলিত-ভাষার পাঠক্রিয়া ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু পূর্বসংস্কার থেকে চলিত-ভাষাকে বিশ্লিষ্ট করে চলিত-ভাষার মধ্যেই যদি আমরা এই সহজ

পথের সন্ধান করি তা হলে ভুল করব। চলিত-ভাষারীতির অপূর্ণতা কোথায়, সাধু-ভাষার শ্রেষ্ঠত্বই বা কোন্‌খানে—এ সব বিষয় ধীর চিত্তে বিবেচনা করে সাধু-ভাষার সংস্কারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি আমরা চলিত-ভাষাদেহের সম্মার্জন তথা সংস্কারের চেষ্টা করি, তা হলেই কেবল যথাযথ পথে চলিত-ভাষার অগ্রগমন সম্ভব। আসল কথা, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য ও ভাবসৌকুমার্যের সঙ্গে বাংলা-ভাষার যোগ হারালে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল" (পৃ. ৪১)। এইটি হচ্ছে বাংলা ভাষার গড়ন সম্পর্কে সব চাইতে আদত কথা। সাধুই হোক আর চলিতই হোক, বাংলা-ভাষারীতিকে সংস্কৃত-রস-চেতনার ভিত্তিভূমির উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। 'সংস্কৃত-রস-চেতনা' কথাটি ব্যবহার করেছেন সুপণ্ডিত ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়। বাংলা-ভাষার কুললক্ষণ ও প্রকৃতি-নির্ণয়ে এর চাইতে সুষ্ঠু কথার ব্যবহার বুঝি কিছু হতে পারত না। ডক্টর দে তাঁর 'নানা নিবন্ধ' গ্রন্থে সংস্কৃত ও বাংলার আলোচনা প্রসঙ্গে অভ্রান্ত হস্তে বাংলাভাষার স্বরূপ নিরূপণ করেছেন, আমরা কথঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবেই তাঁর বক্তব্য এখানে সংকলন করে দিচ্ছি—

"সাধু ভাষাকে অসাধু অপবাদ দিবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা সংস্কৃতবহুল,—সংস্কৃতের নাম উচ্চারণও নাকি পাপ! এখন যে ভাষা সদ্যভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা নাকি সংস্কৃতবর্জিত বলিয়াই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না, সংস্কৃত ও প্রাকৃত, বাংলা ভাষার এই দ্বিবিধ রূপ, যাহা দুই হইয়াও এক, তাহা আকস্মিক নয়, ব্যক্তিবিশেষের যদৃচ্ছারোপিত নয়, তাহা ইহার স্বাভাবিক বিকাশধর্মের বিবর্তন। বাংলা ভাষার জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত যে প্রকৃতি মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত

এই দুই আপাতবিরোধী ভঙ্গির সর্বতোমুখী সমন্বয় ঘটিয়াছে; এবং বাংলা ভাষা একাধারে গাম্ভীর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপন প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষার যে ক্রমবিকাশ, তাহা এই অপূর্ব সমন্বয়েরই ইতিহাস।" (পৃ. ৩৬-৩৭)

এই সমন্বয়ের তত্ত্ব চলিত-ভাষার প্রয়োগকালে আমরা প্রায়শঃ বিস্মৃত হই, আর তারই ফলে চলিত-ভাষা-চর্চার নামে কিম্ভূত এক ভাষাভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিতে আজকাল আর কারও বাধে না। সে এমন এক ভাষাভঙ্গি, যার অতীত নেই আশ্রয়ভূমি নেই, যা শুধু মুখের কথার অনুসরণ করে শূন্যে ঝুলে আছে। পরবর্তী নিবন্ধ রম্যরচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে-জাতীয় ভাষারীতির সমালোচনা করা হয়েছে, তা প্রধানতঃ এই ভাষার কোঠায়ই পড়ে। মুখের কথার হুবহু অনুসরণ করলেই স্বাভাবিক ভাষা হল, এমন মনে করবার কারণ নেই। এইটি আমাদের বিশেষ ভাবে বোঝা দরকার, কেন-না এটি না-বোঝার ফলেই আধুনিক বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রে যত বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে। স্বাভাবিকতার নামে স্বেচ্ছাচার ক্রমাগত প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। মৌখিক ভাষা-ভঙ্গিম চলিত রচনাবিন্যাসের মধ্যে এমন একটা তারল্য ও চটুলতার সুর আছে যে, সূক্ষ্ম ধ্বনিসচেতন কানে তা খট্ করে বাজে। ভাবের আশ্রয় শব্দ, শব্দের আশ্রয় ধ্বনি। ধ্বনিসম্পদে চলিত রীতির রচনা এতই দীন যে, শুধু এই কারণেই তাকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। গম্ভীর ভাবকে আটপৌরে ভাষার বেশ পরাতে গিয়ে আমরা শুধু যে তার সৌন্দর্যের হানি করি তাই নয়, তার স্বরূপেরও বদল ঘটাই। ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থই বলেছেন, "প্রাকৃত (চলিত) বাংলার মজ্জাগত শৈথিল্য ও দুর্বলতা, ইহার লঘু শব্দবিন্যাস, কেবল ওজস্বিতার নয়, রচনার সুষমা ও সামর্থ্যের অন্তরায়"; (সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৯)।

সুন্দর, গভীর-গম্ভীর কথার উপর আটপৌরে ঘরোয়া ভাষার খোলস চড়ালে তার রূপের কতদূর হানি ঘটে, তার সবিনয় প্রমাণ প্রমথ চৌধুরীর রচনা। একটি নমুনা দিই—

"কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতীয় কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়; আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে।"*

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উদ্ধৃত রচনাংশের ভাষাভঙ্গির মধ্যে আর যা-ই থাক্, ধ্বনিমাধুর্য নেই। এ ভাষার গড়ন বড় বেশী চাঁছাছোলা, বড় বেশী রিক্ত। ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে লালিত্য নেই, কাঠিন্যের ভাব আছে। মুখের কথার আদল আনতে গিয়ে স্পষ্টতঃই রচনার মধ্যে তারল্যের সুর আমদানি করা হয়েছে। রসিকতার নামে চটুলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বেশী। হঠাৎ মনে হতে পারে, আমাদের বক্তব্য প্রতিপাদনের সুবিধার্থে, উদ্দেশ্যের সহায়ক জুৎসই একটি বিক্ষিপ্ত অংশ এখানে তুলে দেখানো হয়েছে। তা নয়। এ রকম নমুনা বীরবলের রচনাবলীর মধ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গ বর্জিত হওয়ার প্রশ্নও এ-ক্ষেত্রে ওঠে না, কেন-না ভাবের নমুনা দেখাবার জন্য এ উদ্ধৃতি নয়, মুখ্যতঃ ভাষার নমুনার জন্যই এ উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটির একটি অংশ প্রণিধানযোগ্য—"শব্দের শক্তি অপরিসীম।" অথচ আমরা জানি, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যে শব্দের শক্তি-সম্ভাবনা নির্মমভাবে অবহেলিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত শব্দসম্ভারের ভিতর অর্থের যাথাযথ্য আছে, যুক্তিশৃঙ্খলা আছে, ব্যঞ্জনা-গুণ নেই। সংস্কৃতভাষাসুলভ উদাত্ত ধ্বনিময়তার অভাবে চৌধুরী মহাশয়ের প্রাকৃত

* 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' : সবুজপত্রের মুখপত্র : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩

বাংলা কেমন যেন শুষ্কভাষী ঠেকে। এ যেন গল্পবর্ণিত 'নীরসো তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি' আর 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'-র পার্থক্যকে কেবলই স্মরণ করিয়ে দেয়। *শব্দঝঙ্কার প্রামথিক গদ্যে নেই বললেই চলে।* তাঁর কাব্যেও স্খলিত পদের একান্ত অভাব। উদ্ধৃতির শেষাংশে মশার গুনগুনানির দ্বারা মানুষকে ঘুম পাড়ানোর কথা আছে। মনে হয়, কথাটির মধ্য থেকে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম অর্থ চেষ্টা করলে নিষ্কাষণ করা যায়। ঘুমপাড়ানি গানের বদলে মশার গুনগুনানির সাহায্যে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলে কী ফল হতে পারে, সহজেই অনুমান করা চলে।

সাধু-ভাষার তুলনায় চলিত-ভাষাকে যাঁরা প্রাঞ্জলতর বলেন, বুঝতে হবে আমাদের সনাতন গদ্যরীতির সঙ্গে তাঁদের তেমন যোগ নেই। সাধু-ভাষার রচনারীতির ভিতর যদি কোন আড়ষ্টতা থেকে থাকে, সে হচ্ছে সংস্কৃত শব্দের আধিক্যজনিত আড়ষ্টতা (এ আড়ষ্টতা শক্তিমানের লেখনীতে অল্পায়াসে নিরাকৃত হওয়া সম্ভব), সম্প্রসারিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে স্বাভাবিকতার এতটুকু ব্যত্যয় সেখানে হয় না। 'করছে' বা 'খাচ্ছে'-র স্থলে 'করিতেছে' বা 'খাইতেছে' লিখলেই যেন ভাল শোনায়। শেষোক্ত ক্রিয়াপদদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনির ও ছন্দের যে সঙ্গতি আছে, স্পষ্টতঃই প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের মধ্যে তা নেই। লিখিত ভাষায় 'যাচ্ছে-খাচ্ছে'র ব্যবহার ত্রস্ত-ব্যস্ততার পরিচায়ক, খানিকটা সময় নিয়ে পদকে ছড়িয়ে বলার আয়েস তাতে পাওয়া যায় না। সংলাপের ভিতর ব্যস্ততা বেমানান ঠেকে না, কিন্তু বর্ণনাংশের মধ্যে সনাতন ক্রিয়ার রূপটিই যেন খোলে ভাল। সাধু ভাষাভঙ্গি, বিশেষ সাধু ক্রিয়ার ভঙ্গির মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের আশ্বাস আছে, বলাই বাহুল্য এ গাম্ভীর্য চলিত রীতিতে পদে পদে ব্যাহত হয়।

একটা জিনিস ভাষামনস্কদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন,

যাঁরাই বাংলাভাষায় সাধু রীতি বিলোপের পক্ষপাতী তাঁরাই আবার বাংলাভাষার কাঠামো থেকে সংস্কৃতকে ছেঁটে ফেলতে উদ্যমশীল। *যোগাযোগটি আকস্মিক নয়। সংস্কৃতের সঙ্গে অবনিবনা থেকেই* সাধারণতঃ সাধু-ভাষার সঙ্গে অবনিবনার সূত্রপাত। অধুনা নবীন-বয়সীদের মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি যে সাধারণ বিমুখতা দেখা যায়, প্রায়ই তার ছাপ গিয়ে পড়ে তাঁদের রচনারীতির উপর। ফল হয় এই যে, তাঁদের লেখা সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যবর্জিত মুখের কথারই একটা সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা সাধু রীতির সঙ্গে যে লেখকের যত দূরবর্তী সম্পর্ক, তাঁর লিপিপদ্ধতিতে তারল্যের প্রভাব তত বেশী। মুখের কথার আদলে রচিত অতি সুন্দর ভাব-পরম্পরার মধ্যেও চটুলতার আমেজ থেকে যায়। এ কথার প্রমাণ পূর্বোল্লিখিত চৌধুরী মহাশয়ের গদ্য, অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের গদ্য এবং এখনকার অন্য দুই-চারিজন শক্তিশালী লেখকের গদ্য। এঁদের রচনায় ইংরেজীর প্রভাব যত সক্রিয়, বাংলা-ভাষার নিজস্ব সাধু রীতির প্রভাব তত নয়। অথচ এ কথা কে না জানে যে, ঐতিহ্যানুমোদিত ভাষারীতির সঙ্গে যোগ ছিন্ন হলে ভাষার বুনিয়াদ পাকা হতে পারে না। বাংলা-গদ্যের ভঙ্গি, বিশেষ উনিশ-শতকীয় গদ্যের ভঙ্গি, বিধিমতে আয়ত্ত না হলে বোধ করি চলিত-ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয় না। সাধু-ভাষার গাম্ভীর্য এবং চলিত-ভাষার প্রবহমানতা দুই একত্র সম্মিলিত হলে তবেই শুধু যথার্থ প্রাঞ্জল গদ্যরীতির উদ্ভাবনা সম্ভব। গোড়ায় যে কথা বলেছি সে কথায় ফিরে আসি—সাধু-ভাষা ভালমত রপ্ত না হলে চলিত-ভাষায় যদৃচ্ছা লেখনী চালনার অধিকার জন্মায় না। শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরগুলিতে কথাটি আরও বিশেষ ভাবে খাটে। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু ১৯৫১ সনের নভেম্বর সংখ্যা *The Teachers' Journal*-এ যে কটি মূল্যবান কথা

লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধারযোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলেছেন—

"আজ বিশ-পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করছি, এই দীর্ঘকাল ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে, বিদ্যালয়ে চলিত-ভাষা প্রবর্তিত হওয়ায় ছাত্রদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। তারা ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর না হয়ে যেন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে—শিখছে কম, ভুল করছে বেশি—আগের চেয়ে পরীক্ষায় ফেলও করছে বেশি। অধিকাংশ ছাত্রেরই শব্দসম্পদ অত্যন্ত অল্প, রচনাভঙ্গীও অতিমাত্রায় দুর্বল ও শিথিল আর বহু দোষে দুষ্ট। এ দুরবস্থার অন্যান্য কারণ যত-কিছুই থাক্, চলিত-ভাষা চর্চা করবার এবং চলিত-ভাষায় হালকা চালে লেখা অভ্যাস করবার প্রয়াস যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

বসু মহাশয়ের উক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই সময় 'শনিবারের চিঠির "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিল, সেটিও বক্ষ্যমাণ উপলক্ষে কম প্রণিধানযোগ্য নয়। মন্তব্যের অংশবিশেষ এইরূপ : "শুনিয়াছি, সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলা-ভাষাতেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে ভাষার দুই রূপ ব্যবহৃত হয়, সাধু ও চলিত। ইহার ফল শক্ত ও শিক্ষিতের বেলায় যেমন সুফলপ্রসূ ও অভিনব হইয়াছে, তেমনই অপটু ও অক্ষমের বেলায় হইয়াছে মারাত্মক ও সাংঘাতিক। পদ্যকবিতা পারঙ্গম হইলে যেমন গদ্যকবিতায় হাত খোলে, তেমনই সাধু-ভাষার প্রয়োগে দড় হইলেই তবে চলিত-ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা যায়। সুতরাং এই কথাটাই আমরা বলিতে চাই যে, গোড়ার দুই-তিন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষা যেন সাধু হয়। গোড়াপত্তন ঠিকমত না হইলে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ।"

অত্যন্ত খাঁটি কথা, এবং এই খাঁটি কথাটা ভাষা-প্রয়াসীদের মনে মুদ্রিত করে দেবার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। ভাষা

সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র, ভাবই হল আসল। তবু যে ভাববিচার ছেড়ে আপাতত ভাষাবিচারের উপর জোর দিতে হল সে এই কারণে যে, ভাষা নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রভূত স্বেচ্ছাচার চলছে। এই অনাচার আশু প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা চলিত-ভাষার বিরুদ্ধাচারী নই, শুধু এই আমাদের বক্তব্য, যে-ভাষায় আমরা মনোভাব প্রকাশে উদ্যত তার রূপটি যেন চটুলতাবর্জিত হয়, সৌম্য হয়। মৌখিক বাক্যরীতির অন্ধ অনুসরণ দ্বারা আমরা যেন বাংলা-গদ্যের গভীর-গম্ভীর রূপটির বিকার না ঘটাই। ইংরেজীতে মৌখিক ও লৈখিক ভাষারীতির মধ্যে বৈয়াকরণসুলভ পার্থক্য নেই, তার কারণ শিক্ষিত ইংরেজের মুখের কথা আর লিপির কথায় প্রভেদরেখা তেমন সুচিহ্নিত নয়। অথবা এমনও হতে পারে, ইংরেজের লিখিত ভাষা তাদের মুখের ভাষাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে দুই রীতির মধ্যে পার্থক্য ঘনীভূত হবার অবসর মেলে না। অতি লঘু মেজাজের ইংরেজী রচনায়ও ভাষার যে দৃঢ়সংবদ্ধতা ও সংযম লক্ষ্য করি, আধুনিক বাংলা চলতি রচনায় তা প্রায়শঃ দুর্লভ। চলতি বাংলা গদ্যের কাঠামোর উপর মৌখিক বাক্যরীতির অতিরিক্ত প্রভাবই এ জন্য দায়ী বলে মনে হয়। নিছক মুখের কথার অনুকরণে চলিত-ভাষা লিখিত হচ্ছে বলে ভাষা-ব্যবহারে অনাচার কেবলই প্রশ্রয় পাচ্ছে।

এ থেকে দুইটি বিকল্প সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হয় মৌখিক বাক্যভঙ্গি থেকে লিখিত বাক্যভঙ্গিকে কথঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে আনতে হবে, নয়তো আমাদের খোদ মুখের কথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার প্রয়োজন। বাস্তবসঙ্গতির খাতিরে যদি মুখের কথার অনুসরণেই চলিত ভাষার রূপায়িতকরণ সাব্যস্ত হয়, তাহলে বাঙালীর প্রচলিত কথ্যভঙ্গির পরিমার্জন ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না।

॥ 'রম্যরচনা' ॥

সাহিত্য বহুমুখী। তার চিন্তা ও কল্পনার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। নিত্য নব নব বৈচিত্র্যের সন্ধানে সাহিত্য কেবলই আপনার দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসম্পাদনের আশায় যেমন সে তার পরিধির ভিতর নতুন নতুন ভাবনা কল্পনা ধারণার সমাবেশ ঘটাচ্ছে, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিরও নব নব রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। যুগধর্মের ভেদ ও রুচির তারতম্য অনুযায়ী সাহিত্যের এই-যে নিত্য নব নব বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-প্রয়াস—এ কিছু মন্দ জিনিস নয়। বৈচিত্র্যস্পৃহা মানুষের স্বভাবের গভীরে নিহিত; কাজেই স্বাদ-বদলের আশায় সাহিত্য-পাঠক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে পরিক্রমণ করতে চাইবেন এতে দোষের কিছু নেই।

কথাটা বুঝি শর্তবিরহিত নয়। বৈচিত্র্য ভাল জিনিস, কিন্তু বৈচিত্র্য সম্পাদনের নামে সাহিত্যের গতি কেবলই যদি নিম্নাভিমুখী হতে থাকে, সে ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও এসে সীমারেখা টানতেই হয়। আর যা-ই হোক, বৈচিত্র্য আর গুণাপকর্ষ এক বস্তু নয়। শিল্পোৎকর্ষের অপহ্নব ঘটিয়ে বৈচিত্র্য বিধানের রীতি স্বাদ-বদলের উপায় হিসাবে সাময়িকভাবে গ্রাহ্য হতে পারে; কিন্তু সেটি সাহিত্যের একটি অপরিবর্তনীয় রীতি হয়ে দাঁড়ালেই মুশকিল। ভাবঘন কবিতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়ার কবিতা বা খাপছাড়া কবিতা (nonsense rhymes) পড়তে মন্দ লাগে না; কিন্তু সমগ্র আধুনিক বাংলা-কাব্য-আন্দোলনটি যদি নিরবচ্ছিন্ন ওই ছাঁচেই ঢালাই হতে থাকে, তাহলে কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেই শঙ্কিত হয়ে উঠবেন বলে মনে করি।

সম্প্রতি বাংলা গদ্যসাহিত্যে "রম্যরচনা" নামে এক অভিনব রচনা-রীতির সৃষ্টি হয়েছে। উপরে যে কটি কথা বলা হল, সেগুলি এই-জাতীয় রচনাকে লক্ষ্য করেই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। অলস, লঘু মুহূর্তের মনোরঞ্জনী পাঠ্যক্রম হিসাবে রম্যরচনাকে গ্রহণ করলেও করা যেতে পারে, কিন্তু সেই নজিরে তার জন্যে মনের দ্বার সর্ব সময়ের জন্যে উন্মুক্ত রাখা চলে না। ছোটকে ছোট মাপে গ্রহণ করাটাই রীতি, কিন্তু ছোট যদি বড়র দাবিতে পাঠকের মনের ভিতর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বসতে চায়, তাকে জুলুম আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। ঠিক এ-জাতীয় জুলুম বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক আকারে চলেছে। এক শ্রেণীর পাঠকের লঘুমনস্কতার সুযোগ নিয়ে "রম্যরচনা" নামধেয় কিম্ভূত সাহিত্য-সৃষ্টি পাঠকসাধারণের ঘাড়ের উপর চেপে বসতে চাচ্ছে। রম্যরচনায় রম্যতা কতটুকু আছে বলতে পারব না, তবে চিহ্নিত লক্ষণাদির মানদণ্ডে ওটি যে যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, সে কথা জোর করে বলা চলে। সাহিত্যের বিস্তৃত সঞ্চরণক্ষেত্রকে যদি একটি বিরাট ভোজ্যশালার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে রম্যরচনাকে নিতান্ত তুচ্ছ খাদ্যের অধিক মর্যাদা কোনক্রমেই দেওয়া যায় না। মাঠে-ময়দানে বেড়াতে বেড়াতে ডালমুট চিবোতে মন্দ লাগে না, কিন্তু বলাই বাহুল্য, তার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয় না। শরীরের পুষ্টির জন্য চাই এমন খাদ্য, যার মধ্যে যুগপৎ উপাদেয়তা ও স্বাস্থ্যদ শক্তি আছে। আমাদের মনের খাদ্যনিরূপণে একই নীতি অনুসৃতব্য।

রম্যরচনার রম্যতার ক্ষমতাকে সহজেই উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ যুগের পাঠকসম্প্রদায়ের একাংশের তরল মানসিকতার রন্ধ্রপথে তা ক্রমশঃ সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসছে। প্রবহমাণ যুগরুচির প্রভাবে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে চটুলতা যত বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে, ভাল ও মন্দের ভেদ তত ঘুচে যাচ্ছে। শিল্প-সাহিত্যের ভাল মন্দ চিনে

নেবার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক পরিশীলনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, এই অভ্যাসের আজ আর কোন মূল্য নেই। শিল্পরুচি তৈরি হতে সময় লাগে, রসবোধ আয়ত্তকরণের সাধনা অনেকটা পরিমাণ কাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত হলে তবেই তা থেকে যথার্থ সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আর এ-সব কথা কেউ শুনতে চায় না। নগদ পাওনার লোভে, আশু পাওনার লোভে স্থায়ী পাওনার ঘরকে নির্মমভাবে সংকুচিত করতে আজ আর কারও বাধে না। যুগের দোষে শুধু যে মুড়ি-মিছরি একদরে বিকোচ্ছে তা-ই নয়; ভাব-সাব দেখে মনে হয়, মিছরির চাইতে মুড়ির কদরই যেন বেশী। কাঞ্চনের চেয়ে কাচের জেল্লায় মানুষ সমধিক মুগ্ধ। পাঠক আজকাল রচনায় ভার চায় না, সার চায় না, চায় 'তার'—যে-কোন রকমের রসনাকণ্ডুয়নকারী তার। এই তুচ্ছ তারস্পৃহার তাড়নায় পাঠকের সহজ বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত, ক্ষেত্রবিশেষে অপগত। একালীন মানুষের হাল্কা ফুরফুরেপনার দাপটে সাহিত্য থেকে যথার্থ রসবুদ্ধি বিলুপ্ত হবার উপক্রম। চিন্তার অভ্যাসও অন্তর্হিতপ্রায়। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে রম্যরচনা যথার্থ সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত রচনাকে গায়ের জোরে পিছনে ফেলে রেখে নিজের অনুকূলে সবটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

রম্যরচনাকে 'কিম্ভূত' বলা হয়েছে নানা কারণে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের সেই ধারাকেই আজ রম্যরচনা নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যার ভিতর স্থির কোন বক্তব্য নেই, সবটাই যার অনিয়ন্ত্রিত, অগোছালো, ঢিলে-ঢালা। রম্যরচনায় চিন্তার সংযমের প্রয়োজন হয় না; বক্তব্যকে যুক্তিপরম্পরাক্রমে বিস্তারিত, পরিণামে প্রতিষ্ঠিত করবার যে রীতি প্রবন্ধ-সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম, সে রীতি এখানে না মানলেও চলে। রচনার ভিতর হাল্কা স্ফূর্তির আমেজ লাগাতে গিয়ে ওর মধ্যে এমন একটা বাগ্‌বাহুল্যের আবহাওয়ার সঞ্চার করা হয় যে, তার সংস্পর্শে

এসে বুদ্ধির স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য স্বতঃই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। রম্যরচনার যে সকল নমুনা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় তা থেকে মনে হয়, যে কোন বিষয়ে যে কোন ভঙ্গিতে খানিকটা বাগ্‌বিস্তার করতে পারলেই তা রম্যরচনা হল। এখানে চিন্তার দায় নেই, পরম্পরা রক্ষার দায় নেই, বক্তব্য প্রতিপাদনের দায় নেই। গালগল্পের আসরে লোকে যে রকম হাল্কা ভঙ্গিমায় কথা বলে, কথাবার্তার ভিতর প্রয়োজনবোধে ছ্যাবলামির সুর লাগাতে দ্বিধা করে না, তাকেই বোধ করি লিখিত আকারে প্রকাশ করলে তা রম্যরচনায় গিয়ে দাঁড়ায়।

শুনি, আধুনিক বাংলা রম্যরচনাকে ইংরেজী essay-র সমগোত্র মনে করা হয়। এই প্রতিতুলনা মনে কৌতুকের সঞ্চার করে। ইংরেজী essay-র ঐতিহ্যের শুরু মহামতি বেকন থেকে, তারপর বহু বহু সাহিত্যরথীর লেখনীর ধারে তার রূপ শাণিত হয়েছে, ক্রম-উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘকালের অনুশীলনের ফলে ইংরেজী সাহিত্যে essay-র একটি অবিচল মান দাঁড়িয়ে গেছে। ফরাসী সাহিত্যেও essay-র ঐতিহ্য পুরাতন, এবং ইংরেজী সাহিত্যের মতই সমৃদ্ধ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যগ পথের অনুসারী ভূয়োদর্শী মন্তেইন গদ্যালোচনায় সরস মৃদুবাক্ অথচ জ্ঞানগর্ভ যে রচনারীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে ফরাসী নিবন্ধ-সাহিত্য আজ বহু দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্য নিবন্ধরচনার দিক দিয়ে ওই দুই সাহিত্যের তুলনায় ঢের ঢের পিছনে পড়ে আছে। কাব্য-সাহিত্যে আমাদের কীর্তি রটনাযোগ্য, কথা-সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্প-শাখায়ও সাফল্যগৌরব কিছু কম নয়; কিন্তু সাহিত্যিক নিবন্ধরচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য লাভের জন্য এখনও আমাদের দূর পথ অতিক্রম করতে হবে। প্রবন্ধরচনার জন্য যে সুতীক্ষ্ণ যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাষার যাথাযথ্যের বোধ (precision) দরকার, তা এখনও আমাদের

লেখনীতে ভাল রপ্ত হয় নি। সাধারণ প্রবন্ধ বা নিবন্ধের বেলায়ই যখন এই কথা, তখন রম্যরচনা-নামধারী লঘু প্রবন্ধের বেলায়ও যে এ কথা কত সত্য তা সহজেই অনুমান করা চলে। দুই-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, রম্যরচনায় এখনও আমরা নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলছি। রম্যরচনার শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হতে না হতেই সে যদি বিভিন্ন শাখার সাহিত্যের স্বীকৃত রূপগুলিকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বসে, তবে তো বড়ই বিপত্তির কথা।

বিদেশী *belle-lettres*-এর একটি অঙ্গ হল personal essay বা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'। আমাদের সাহিত্যের নবোদ্ভিন্ন রম্যরচনা-সাহিত্যকে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমার্থক মনে করে থাকেন। এই প্রতি-তুলনাও নিষ্ফল। লঘু মেজাজের রচনার ভিতরে পাকেচক্রে খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটালেই তা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হল এমন মনে করবার কারণ নেই। খোসগল্পের আসরে লোকে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে, নিজ নিজ রুচি পছন্দ ছিট ও বাতিক সবিস্তারে ব্যাখ্যান করে; আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ রম্যরচনাকার ঠিক এই ধারাটিকেই সাহিত্যের আসরে প্রমোশন দিয়েছেন দেখতে পাই। কিন্তু এ-জাতীয় আত্মকথন আর ব্যক্তিকধর্মী রচনার জাতকে কোনক্রমেই এক করে দেখা চলে না। ব্যক্তিকধর্মী রচনার আর্ট ফুটিয়ে তুলতে হলে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রয়োজন হয়, যে বোধ তথাকথিত রম্যরচনাকারদের অধিকাংশেরই নেই বলে আমার ধারণা। এঁদের লেখায় বাগ্‌বিস্তার আছে, কলরব আছে, আত্মপ্রচার আছে, ব্যঞ্জনা নেই। মৃদু-মধুর অথচ ফলপ্রদ 'স্বরে কথা বলবার কৌশল এঁরা জানেন না। চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা বৈঠকখানার গালগল্পের ভাষায় স্বভাবতঃই কেউ সংযম বা যুক্তিশৃঙ্খলা আশা করে না। কুরুচির প্রবেশও বোধ করি সেখানে সব সময় নিষিদ্ধ

নয়। আদিরসের মিশাল না দিলে আড্ডার গালগল্প এক-এক সময় বাস্তবিক জমতে চায় না, সেই সঙ্গে যদি পরচর্চার লঙ্কা-ফোড়ন দেওয়া যায় তো আরও ভাল। কিন্তু এ তো হল বাস্তব জীবনের বৈঠকী আলোচনার ধারা ; বাস্তবতার নজিরে তাকে সাহিত্যে পাংক্তেয় করবার চেষ্টা করলে ঘটে বিপত্তি। জীবনের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব এক নয়। যা বাস্তব জীবনের সীমায় মানায় ভাল, তাকে বাস্তব জীবনের স্বকীয় পরিসরের ভিতর ধরে রাখাই উচিত ; গায়ের জোরে তাকে সাহিত্যের জাতে তোলবার চেষ্টা করলে ফল ভাল না হওয়ারই কথা।

আধুনিক বাঙালী রম্যরচনাকারেরা তাঁদের রচনা-প্রয়াসের দ্বারা ক্রমাগতই সমালোচনার খোরাক জুটিয়ে চলেছেন বলে মনে হয়। তাঁদের চোখে সাংসারিক বাস্তব আর সাহিত্যিক বাস্তবের ভেদ লুপ্ত। রচনা-রীতির ভিতর স্ফূর্তির আমেজ না থাকলে নাকি রম্যরচনার রম্যতা বিহিত হয় না, তাই রম্যরচনাকারেরা তাঁদের রচনাকে স্ফূর্তিমতী করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, আমুদেপনা আর স্ফূর্তিমত্তা এক জিনিস নয়। স্ফূর্তি প্রাণবন্ততার প্রতীক, আমোদ স্থূল সুখান্বেষণ-স্পৃহার। খোসগল্পের চটুলতার মধ্যে এক ধরণের সজীবতা আছে, তবে তা সহজ প্রাণস্ফূর্তি নয়, ওটি আমুদেপনারই একটি ঢঙ মাত্র। আধুনিক রম্যরচনাকারেরা এই জায়গাতেই করেন সব চাইতে বড় ভুল। তাঁরা আমুদেপনাকে প্রাণস্ফূর্তির স্বগোত্র ধরে নিয়ে ভাষার লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। রম্যরচনাকারদের ভাষণমুখরতায় কান পাতা দায় হয়ে উঠল। যে হারে কলরব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রোয়াকের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষায় প্রভেদ নির্ণয় করবার জন্য শীঘ্রই হয়তো বিচক্ষণ ভাষাবিদ্‌কে ডাকবার প্রয়োজন হবে। ভাষার সৌষম্য ব্যঞ্জনা মৃদুতা—এগুলি দিনে দিনে কথার কথা হয়ে উঠছে। ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাষারীতি অনুসরণের দায় নেই, দায় নেই

ব্যাকরণ কিংবা স্বীকৃত প্রকরণাদি মানবার—কেবল আড্ডার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রগল্‌ভ হতে পারলেই হল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ গালগল্প দিয়ে পাতার পর পাতা ভরাতে পারলেই হল। না ভাবের সৌকুমার্য, না চিন্তার সংযম। রচনার কাব্যসৌন্দর্য অদৃশ্যপ্রায়। লেখায় যে অনুপাতে প্রগল্‌ভতা, সে অনুপাতে কল্পনার নিষ্প্রভতা। ভাষার শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের সৌন্দর্যও রম্যরচনার পরিধি থেকে অন্তর্ধান করেছে।

রম্যরচনার বেলায় কোনরকম বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা হয় না। কবিতা ছোটগল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি সাহিত্যের সব কটি শাখাতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণ মেনে চলবার দায় আছে; এখানে সে রকম কোন দায় নেই। লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ী রম্যরচনার ভিতর একদিকে যেমন কবিতা ও ছোট-গল্পের উপাদান ঢোকান যায়, তেমনি সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদন, ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, গালগল্প—কোনটাই সেখানে অপাংক্তেয় নয়। প্রয়োজনবোধে নিছক রাশ-আলগা-করা জল্পনা-কল্পনার দ্বারাও পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতে বাধা নেই। লিখনভঙ্গির এই বল্গাহীনতার জন্য রম্যরচনার কাঠামো স্বতঃই হয়ে উঠেছে নিতান্ত ঢিলেঢালা, অগোছালো, পূর্বাপরসম্বন্ধবিবর্জিত। অর্থাৎ রম্যরচনার গঠনকর্মে পূর্বপরিকল্পনার স্থান নেই। এখানে আগে থেকে ছক কষে, মাপজোপ এঁকে, ভেবে চিন্তে কিছু লেখা হয় না; পালের হাওয়ায় স্বয়ং-চালিত নৌকার মত অনিয়ন্ত্রিত ভাবাতিশয্যের বেগমুখে লেখনীকে যদৃচ্ছা ছেড়ে দিলেই হল। প্ল্যানচেট-শাসিত লেখনীর উপর যেমন আপাতসম্মোহিত ধারকের ইচ্ছার জোর খাটে না, তেমনি রম্যরচনার ভূত একবার কাউকে পেয়ে বসলে লেখনী আর লেখকের শাসন মানতে চায় না। রম্যরচনার আদি বা সূচনা কোন্ পরিণামে

গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করবে, সে কথা বোধ করি রম্যলেখক নিজেই জানেন না।

রম্যরচনার এই দিকটি বিশেষভাবে বোঝা দরকার। আর এইটি বুঝলে অন্যান্য শাখার সাহিত্যকর্মের তুলনায় তার সহজাত অপকৃষ্টতা অচিরেই ধরা পড়বে বলে মনে করি। ডাঃ জনসন যখন ইংরেজী লঘু প্রবন্ধকে 'a loose sally of the mind' বলেন, তখন তিনি যে শুধু তার প্রকৃতি ও সংজ্ঞা নির্দেশ করেন তা-ই নয়, অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় তার স্বাভাবিক গুণাপকর্ষের প্রতিও অঙ্গুলি ক্ষেপণ করেন। কারণ সাহিত্যে—বস্তুতঃ সকল প্রকার শিল্পেই—looseness বস্তুটি অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য। আত্ম-আরোপিত সংযমের শাসন মেনে চলার মধ্যেই শিল্পকর্মের স্ফূর্তির সঙ্কেত নিহিত। শিল্পের রূপ যত আঁটসাঁট, বাহুল্যবর্জিত, আদিমধ্যঅন্ত-সম্বন্ধযুক্ত হবে, তত তার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হবে। ছন্দ এবং মিলের বাঁধন মেনে চলতে হয় বলেই কবিতার সৌন্দর্য অপ্রতিরোধ্য; তাললয়বিহীন কণ্ঠস্বরকে কিংবা যদৃচ্ছ সুরের ক্ষ্যাপামিকে কেউ গান বলে না। শিল্পের প্রকাশভঙ্গির বেলায়ও আত্ম-আরোপিত শাসন পদে পদে মেনে চলার দায়িত্ব অলঙ্ঘ্য। কোথায় আরম্ভ করতে হবে কোথায় শেষ, কোথায় ঝোঁক দিতে হবে কোথায় ঝোঁক কমাতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পকারকের মনে যদি পূর্ব-নিরূপিত ধারণা না থাকে, তা হলে নিছক ভাবাবেগের বশে তিনি বোধ হয় শিল্পকর্মকে খুব বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। রম্যরচনায় কথিত পূর্বনিরূপণের কোন বালাই নেই, ফলে সংযম-শাসনেরও বালাই নেই। হাওয়ার গতি সেখানে অনির্দিষ্ট। গতির এই অনির্দেশ্যতার জন্য রম্যরচনারূপ কাগজের নৌকা প্রায়ই আঘাটায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্গে রম্যরচনার প্রতিতুলনার কথা বলা হয়েছে। প্রতিতুলনাটি সার্থক হলে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু সে সার্থকতার

প্রমাণ কই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং তাঁর শিষ্য-অনুশিষ্যরা রম্যরচনার যে ধারাটির প্রবর্তন করেছেন, তার সঙ্গে সত্যিকার ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাধরণের মিল সামান্য। বরং এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রজিৎ', 'রঞ্জন' প্রমুখকে স্বীকার করা যায়, সৈয়দী রীতিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অনেকটা লিরিক কবিতার মত। লিরিক কবিতা যেমন কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতির সুবাসে ভরপুর, তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও কাব্যিক ব্যঞ্জনারীতি অনুসরণ করে মৃদু-মোলায়েম ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা পুলক-বেদনার অনুভূতিকে রূপ দেওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, সেইটেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আসল রূপ। অথচ এ রূপের সঙ্গে আজকের দিনের তথাকথিত রম্যরচনার কতই না তফাৎ! এখনকার রম্যরচনায় আত্মকীর্তন আছে, আত্মোদ্‌ঘাটন নেই; কলরব আছে, মৃদুভাস নেই; স্থূলতা আছে, শালীনতা নেই; এক কথায় গদ্য আছে (তাও গদ্যের ঠাটমাত্র), কাব্য নেই। আর কাব্যই যদি না থাকল, রচনাকে রম্যতা-গুণের দ্বারা চিহ্নিত করবার অর্থ হয় না।

আমাদের কেউ ভুল বুঝবেন না। ভাষায় গণতান্ত্রিকীকরণের আমরাও পক্ষপাতী। সাহিত্যের ভাষা যত সুবোধ্য হবে এবং যত বেশীসংখ্যক মানুষের আয়ত্তগম্য হবে তত দেশের কল্যাণ। তা বলে গণতান্ত্রিক্রীকরণের নামে ভাষার অশালীনীকরণের অর্থ হয় না। রুচির অধঃপাত ঘটিয়ে ভাষাকে যাঁরা বৃহত্তরসংখ্যক পাঠকের অধিগম্য করে তুলতে চান আমরা তাঁদের দলে নই। যুগভেদে ভাষারীতির নানা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় প্রকাশভঙ্গির dignity বজায় রাখা চাই। ভাষার dignity-র সঙ্গে সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের সম্পর্ক নিবিড়। এই সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের মান কোন

সময়েই ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। আধুনিক গণতন্ত্রের মানদণ্ড অনুসারে, সামাজিক কৌলীন্যের মূল্য না থাকতে পারে, না থাকাই উচিত, কিন্তু এই আদর্শ ক্ষেত্রান্তরে প্রয়োগ করলে অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে। সাংস্কৃতিক জীবনে ভাব ও ভাষায় কৌলীন্য সর্বাবস্থায় রক্ষিতব্য।

অথচ ঠিক এই আদর্শটিরই মূলে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ লেখকগণ ক্রমাগত আঘাত হানছেন। রম্যরচনাকে সার্থকনামা করবার অধীর আগ্রহে প্রাকৃতজনের ততোধিক প্রাকৃত আটপৌরে ভাষাভঙ্গির কোঠায় সাহিত্যের স্বীকৃত ভাষাকে তাঁরা নামিয়ে আনছেন। এই vulgarization-এর প্রক্রিয়া বাধাবন্ধহীনভাবে চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে তার শেষ হবে, পূর্বাহ্ণে বোধ হয় তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

অদ্ভুত ভাষাভঙ্গিম রম্যরচনার এই আধুনিক রীতিকে হুতোমী ভাষারই একটি অভিনব সংস্করণ জ্ঞানে কেউ কেউ তাকে প্রবলভাবে সমর্থন করছেন। যেন শুধুমাত্র এই নজিরের জোরেই কোন একটি ভাষাভঙ্গি নানাবিধ ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পার পাওয়ার যোগ্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র যুগ পিছনে ফেলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আজ ইচ্ছা করলেই আমরা হুতোমী স্টাইলের সঙ্কীর্ণ পরিসরের ভিতর ফিরে যেতে পারি না। আজকের দিনের কোন লেখক যদি তাঁর রচনায় হুতোমী স্টাইল হুবহু চালাবার চেষ্টা করেন, তেমনি অমার্জিত আর রুচিহীন ভাষা তাঁর মনোভাব প্রকাশের বাহন হয়, তা হলে তাঁর সে সাহিত্যপ্রয়াস সর্বথা ধিক্কৃত হওয়ারই কথা। হুতোমী এবং সৈয়দী ভাষার সমর্থকবৃন্দের একটি কথা জেনে রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের মনের জগতের গভীর পরিবর্তন সাধন করে গেছেন, আমাদের চিন্তাভঙ্গি ও রুচির মোড় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বব্যাপী প্রভাব চোখের সামনে একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত হিসাবে

বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যে আজ হুতোমী ভাষায় প্রগল্‌ভতা করার কথা ভাবতে পারে, এ আমাদের ধারণায়ও আসে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে অন্য অনেক শিক্ষার সঙ্গে রুচির পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাও আমরা লাভ করেছি। ওটি এতদিনে আধুনিক লেখকবর্গের অন্তরস্থ হওয়ার কথা। আজকের দিনের সাহিত্যিকের কাছে এইটেই প্রত্যাশিত যে, যা-কিছু অশালীন, যা-কিছু স্থূলরুচি, তার দিক থেকে তিনি স্বাভাবিক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রাখবেন; স্বীয় রচনারীতির ভিতর ভাষার ব্যভিচার তিনি কোনমতে ঘটাতে দেবেন না। কিন্তু কার্যতঃ প্রায়শঃ এর বিপরীত দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ততঃ, তথাকথিত রম্যরচনার ক্ষেত্রে যে এই দৃষ্টান্তের প্রচুর সদ্ভাব মিলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

॥ বর্তমান সাহিত্য ও সমাজ-পরিস্থিতি ॥

আমাদের বর্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি, ধারাধরণ পর্যালোচনা করলে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব তথ্যের সব কটিই যে সমান প্রীতিকর এমন মনে করবাব কারণ নেই। এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশী বেড়ে গিয়েছে। একদিকে যেমন লেখক-সংখ্যা রচনা-সংখ্যা পুস্তক-সংখ্যা ইত্যাদির দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্রমস্ফীতি ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি সেই সব লেখক, রচনা আর পুস্তক সম্পর্কে সমাজ-মানসে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এর একটা কারণ স্বাধীনতা-পরবর্তী পরাধীনতার গ্লানি থেকে মনের মুক্তিলাভের অনুভূতি; অন্য কারণ শিক্ষার বিস্তৃতি। শিক্ষা বলতে আমি এখানে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার কথা বলছি না, সাধারণ লিখনপঠনক্ষম শিক্ষাকেই বোঝাচ্ছি। শিক্ষিতের হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এ সত্য জলজ্যান্ত; তবে সংস্কৃতিমূলক বা উদার শিক্ষার প্রচারে বর্তমান সরকারের কোনরূপ কৃতিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। সে যাই হোক, সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যকর্মী সম্পর্কে জনমনে যে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহের প্রবলতার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুদ্রিত পুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা জনমনের উৎসাহেরই রকমফের মাত্র।

এ সবই শুভলক্ষণ। কিন্তু আগাগোড়া সব লক্ষণই অগ্রগতি বা উন্নতির সূচনা করছে এমন কথা বলা চলে না। যুগটা গণতন্ত্রের। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এখনকার সাহিত্যে বেশ প্রবল ভাবেই প্রতিফলিত। শুধু যে সাহিত্যের ভাববস্তুর মধ্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শের

প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে তাই নয়, লেখকদের শ্রেণীস্বরূপের মধ্যেও আমরা গণতন্ত্রের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছি। আজকের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন। তাঁদের শ্রেণীস্বরূপ তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে অবধারিতভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবিত্ত বা অভিজাত সমাজের মানুষ। অবসর তাঁদের জীবনে ছিল প্রচুর এবং সেই যুগে অনেকে অবকাশরঞ্জনী মনোবৃত্তির পোষকতাবশেই প্রধানতঃ সাহিত্যচর্চা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আমল পর্যন্ত মোটামুটি এই নিয়ম চলে এসেছিল, শরৎচন্দ্রের সময় থেকে পরিবর্তনের শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত স্তরোদ্ভূত লেখক ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় আবির্ভূত হতে থাকেন। এখন পর্যন্ত ওই ধারা অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে, শুধু তাই নয়, ওই ধারার সম্প্রসারণও ঘটেছে। এখন দুই-একজন শ্রমিক-কৃষক সমাজেরও প্রতিনিধি দেখা যাচ্ছে লেখক-সমাজের মধ্যে। এ রকমটি আগে ছিল না।

তবে এই বিস্তার ও সম্প্রসারণ সামাজিক বিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই বুঝি অবধারিত ছিল। লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধি আর সাহিত্যের পরিধির বিস্তৃতির মানেই হল জনজীবন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া—কি সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে, কি লেখকদের শ্রেণীস্বরূপের বিচারে। এত এত লেখক বর্তমানে লিখছেন সে কি একটা আকস্মিক ঘটনা? এখন বোধগম্য কারণেই লেখকসংখ্যা উচ্চবিত্ত আর অভিজাত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, যুগের টানে মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় লেখকসমাজের গণ্ডীর মধ্যে এসে ধরা দিচ্ছেন সাহিত্যকর্ম জিনিসটা যত বেশী অর্থকরী হচ্ছে তত বেশী সাধারণ আর্থিক স্তরের মানুষ সাহিত্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। লেখা বর্তমানে একটা

বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকার অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিকট সাহিত্যের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য অর্থকরী আকর্ষণটাই একমাত্র আকর্ষণ এমন কথা বললে ভুল হবে, তবে এটিও যে তাবৎ সাহিত্যিক কর্মতৎপরতার পিছনে অন্য কতিপয় অভিপ্রায়ের সঙ্গে একত্র প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে বিষয়ে বুঝি ভুল করবার যো নেই। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চেহারা স্পষ্টাস্পষ্টিভাবেই মধ্যবিত্ত সাহিত্যের চেহারা। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা এ সাহিত্যের ভাববস্তু ও ভাষাপ্রকরণ উভয়ই সমানভাবে প্রভাবিত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত জীবনে ভাঙন ধরেছে অনেকদিন থেকেই, কিন্তু সাহিত্যে এখনও মধ্যবিত্ত আদর্শেরই আধিপত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রবহমাণ গণতান্ত্রিকতার মধ্যেই তার মধ্যবিত্ত স্বরূপ লুক্কায়িত রয়েছে বলা যায়।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট শ্রেণীস্বরূপ, এর দ্বারা পূরাপুরি আমরা লাভবান হয়েছি এমন কথা বলতে পারব না। সাহিত্যের আত্যন্তিক মধ্যবিত্ত প্রবণতার মধ্যেই যেন ওই সাহিত্যের মজ্জাগত অপকর্ষের বীজ প্রোথিত রয়েছে বলে মনে হয়। সত্য বটে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে বহু বহু লেখক কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের রচনার পরিমাণ পূর্ব-পূর্ব যুগের লেখকদের রচনার পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু তাঁদের রচনার মান কি পরিমাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানুপাতিক হারে এগিয়ে যেতে পারছে? লেখকদের পরিমাণগত স্বীকৃতির সঙ্গে কি গুণগত স্বীকৃতি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এত এত লেখক যে ক্রিয়াশীল রয়েছেন, তাঁরা কি বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করতে পারেন? সাহিত্য হচ্ছে সমাজ মনোকুসুমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুসুম, এমন যে সেরা সৌন্দর্য ও সুষমায় ভরা সাহিত্যকুসুম, তা কি

আপনার অভিমুখে সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীজন রূপ অলিদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রূপটি যেমন মূলতঃ মধ্যবিত্ত, তেমনি তার গুণও মধ্যম শ্রেণীর। উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত মানুষেরা সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত নেই বলেই আমার ধারণা। তাঁরা ভিন্নতর বৃত্তির আকর্ষণে সাহিত্যকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের শক্তি উদ্যম আর সময়কে অন্যত্র নিয়োগ করে সমাজজীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। যে গুণপনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে সাহিত্যকে নানা দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারত, সেই সব নৈপুণ্য ভিন্নতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে তত্তৎ বিভাগের উন্নতি বিধান করছে। সুতরাং, স্বভাবতঃই অন্যান্য বিভাগের বেলায় যা লাভ, তা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্য চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তির অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। আমাদের বর্তমান সাহিত্য গণতান্ত্রিক প্রবণতাযুক্ত হতে পারে, মধ্যবিত্ত মানসিকতাযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার যে আভিজাত্য নেই সে কথা অতি সত্য। সাহিত্যের আভিজাত্য খুইয়ে আমরা সাহিত্যের গণতন্ত্রকে ভজনা করছি। এ কথা যে কথার কথা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে এখনকার সাহিত্যের তুলনা করলেই সে বস্তু আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারব। সাহিত্য এখন প্রচুর সৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর বই বেরুচ্ছে, পাঠকসমাজে সে সব লেখা আর বই নিয়ে প্রচুর উৎসাহেরও সঞ্চার হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের মানের সুস্পষ্ট গুণাপকর্ষ ঘটেছে বলে আমার ধারণা। সৃষ্ট সাহিত্যের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে, তার মান সেই হারেই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সাহিত্যের বিস্তার হচ্ছে, গভীরতা সাধিত হচ্ছে না। অনেকানেক লেখকে মিলে সাহিত্যের একটি প্রকাণ্ড সৌধ দাঁড় করিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার ভিত্তি পলকা এবং তা তথাকথিত মার্কিন আকাশচুম্বী

অট্টালিকার মত সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যবিহীন। এখন মাথা-গুণতিতে লেখকেরা খুবই ভারী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের মাথা ভারী নয়। সাহিত্যে তরল রসেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যায় মাথাভারী লেখকেরা হাল্কা মগজে চটুল সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন।

যদি বলেন, সাহিত্যে যে মধ্যমগুণযুক্ত লেখকরা আসর জাঁকিয়ে আছেন তার নিশ্চিত প্রমাণ কী? তার নিশ্চিত প্রমাণ এই যে, বেশীরভাগ লেখকই তথাকথিত গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মূলতঃ চিত্তবিনোদনী সাহিত্যসৃষ্টিতে নিরত আছেন; কাব্যে নাট্যে বা প্রবন্ধ-সন্দর্ভ-সমালোচনা-জাতীয় চিন্তামূলক সাহিত্য-রচনায় তাঁদের ক্ষমতার ব্যবহার হচ্ছে না। গল্প-উপন্যাস খারাপ জিনিস তা বলছি না। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের স্তরভেদ আছে, প্রকারভেদ আছে। যে গল্প-উপন্যাস নিতান্তই পর্যবেক্ষণনির্ভর, যার পিছনে মনন নেই চিন্তার উদ্দীপনা নেই, যা শুধু কাহিনীবিস্তারেই সীমাবদ্ধ ও তাতেই নিঃশেষিত, তেমন গল্প-উপন্যাস দিয়ে যে সাহিত্যের খুব বেশী সমৃদ্ধি হয় এমন মনে করবার হেতু নেই। আজকাল এই জাতীয় গল্প-উপন্যাসেরই প্রচলন বেশী, প্রভাব বেশী। একান্তভাবেই কাহিনীমাত্রসার মননবিহীন রচনা। সংবাদপত্রের রিপোর্টিং-এর সঙ্গে এখনকার প্রচলিত গল্প-উপন্যাসের পার্থক্য শুধু আয়তনে, প্রকারে নয়।

এই-যে মননবিরহিত কাহিনীসর্বস্ব রচনা, এই আদর্শটি প্রকারান্তরে লেখকদের বিশিষ্ট শ্রেণীস্বরূপের প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। লেখকেরা মধ্যবিত্ত আর মধ্যশক্তি বলেই তাঁদের রচনার ভিতর মননের এত দৈন্য। তাঁদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে, সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে উপযুক্ত সাহিত্যসম্মত ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতাও মোটামুটি তাঁদের আয়ত্তে, কিন্তু তাঁদের রচনার পিছনে মননের দ্যোতনা অনুপস্থিত। এই সব রচয়িতার দল গল্পবয়নের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতার

অনুশীলন করবার অবকাশ জীবনে মোটে পান নি। তাঁরা বৈদগ্ধ্যের অনুশীলন করেন নি, সাংস্কৃতিক মনঃপ্রকর্ষের অনুশীলন করেন নি। তাঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বরূপ তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে পদে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে রয়েছে। ফলে তাঁরা জীবনে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ ভাবে পরিপুষ্ট করে তোলার অবকাশ পান নি। বিদ্যাচর্চা আর জ্ঞানের অনুশীলনের দিকে তাঁদের প্রচণ্ড ঘাটতি থেকে গেছে। তাঁরা তাঁদের সহজ রচনা শক্তির উপর যতটা নির্ভরশীল হয়েছেন, মননশীলতার আদর্শকে তার একাংশও অবলম্বন করতে পারেন নি। বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে দুই-চারিটি ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিলে (যথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ ঘোষ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি) আর সকলেই প্রায় মননের দ্যুতিহীন কাহিনীসার গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির লৌকিক আদর্শটিকে আঁকড়ে আছেন বলে মনে হয়।

কাহিনীর নির্বাচনেও তেমন বিচারক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সবাই প্রায় ব্যতিক্রমবিহীনভাবে প্রথম-দর্শনে-প্রেম-উপজিল বা তথাকথিত চাওয়া-পাওয়ার কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত। এই ধরণের কাহিনী তরুণ মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে কিন্তু বিচক্ষণ মনের খোরাক এর মধ্যে নেই। বিচক্ষণ পাঠকেরা কাহিনীর মধ্যে জৈব প্রেমের বর্ণনা চান না; তাঁরা চান এমন কাহিনীর রূপায়ণ, যা তাঁদের চিত্তকেও বিনোদন করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাবজীবনকেও অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করবে। এমন কাহিনী আজকাল ক'টা লেখা হয় সেই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করা চলে।

আসলে, এখনকার লেখকেরা অধিকাংশই স্থূল জনপ্রিয়তার আদর্শের পূজারী। তাঁদের খ্যাতি কৃতিত্ব সাফল্য ইত্যাদির ধারণা তথাকথিত জনপ্রিয়তার মাপকাঠি দিয়ে মাপা এবংমুখ্যতঃ ওই সূত্র থেকেই পাওয়া।

লোকপ্রিয় হবার জন্যে তাঁদের আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই। লোক-প্রিয়তার এঁরা ভজনা করেন নানা ভাবে—কখনও সস্তা কাহিনী রচনা করে, কখনও সিনেমাঘেঁষা সস্তা পত্র-পত্রিকায় লিখে, কখনও রুচিবিগর্হিত চটকদার সব মলাটের আবরণে স্বীয় রচনাকে প্রকাশিত হতে দিয়ে। জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে সাহিত্যসৃষ্টির যে একটা উচ্চতর মান আছে, তা খুব কম ক্ষেত্রেই এই সব জনপ্রিয়তার আশ্রয়ী লৌকিক লেখকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা এঁরা আবিষ্ট বলেই, জনপ্রিয়তার প্রতি এঁদের এত লোলুপতা। সাধারণ পাঠকের বাহবা কুড়তে পারলে এঁরা বোধ হয় আর কিছু চান না। কোন এক আধুনিক সমালোচক জনপ্রিয়তাকে "দুর্গন্ধবাহী" (malodorous) আখ্যা দিয়েছেন। আমি অবশ্য এতদূর যেতে চাই না। তবে জন-প্রিয়তার আদর্শের ভিতর যে চটুলতার অনেকখানি আমেজ আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। জনপ্রিয়তার যাঁরা সাধক তাঁরা তাঁদের রচনার মান অবনীত না করে পারেন না। জনপ্রিয়তার মধ্যেই ওই অবনয়নের বীজ নিহিত আছে। যেখানে বিজ্ঞ, অর্ধ-বিজ্ঞ বহু মানুষকে একই কালে পরিতৃপ্ত করবার সমস্যা, সে স্থলে রচনার উচ্চ আদর্শের আংশিক খর্বীকরণ বোধ হয় অনিবার্য। বহুজনের প্রত্যাশা পূর্ণ করেও রচনার উন্নত মান অক্ষুন্ন রাখা—সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। পুরাতন ক্লাসিক রচনার এই গুণ ছিল; এখনকার চটুলতাধর্মী সাহিত্যের কাছ থেকে এ জিনিস আশা করা যায় না।

কাহিনী-নির্বাচনে বিচারহীনতার কথা বলেছি। প্রসঙ্গটিকে আরও একটু বিস্তারিত না করলে ওই মন্তব্যের তাৎপর্য বোধ হয় সম্যক্ পরিস্ফুট হবে না।

আজকালকার যে-কোন উপন্যাস-গল্পের বই হাতে নিলেই দেখা যায়, সে সবের কাহিনী জৈব প্রেমের বর্ণনায় ভরপুর। শুধু যে সাধারণ

ক্ষমতার লেখকেরাই এই-জাতীয় কাহিনীকে তাঁদের বইয়ের উপজীব্য করেন তা-ই নয়, অনেক সময় নামী লেখকেরাও বিষয়বস্তুর মনোনয়নে এবম্বিধ দুর্বলতার পরিচয় দেন। অপকৃষ্ট যুগরুচির জন্যই এইরূপ ঘটে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে আভিজাত্যের ধারণা অন্তর্হিত হওয়ার পর এই জাতীয় স্থূল প্রেমের আদর্শ লেখকদের কল্পনাকে বিশেষভাবে অধিকার করেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা আভিজাত্যকে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছি। এই আভিজাত্য মনের আভিজাত্য, অনুভূতির আভিজাত্য, রুচির আভিজাত্য। গভীর জীবনবোধের সঙ্গে এই আভিজাত্যের যোগ আছে। এখন সে সবের বালাই নেই। বাংলা সাহিত্যে জন-প্রিয়তার আদর্শ ক্রমবিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচির স্থূলতা লেখকদের ভাব ও কল্পনাকে ক্রমশঃই অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করে চলেছে। শরৎচন্দ্রের সময় থেকে ওই রুচিবিকারের শুরু, কল্লোল-যুগের লেখকদের মধ্যে তার উগ্র প্রকাশ, এখনও সেই অল্পবিস্তর আবিল ধারা অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্য এগোচ্ছে।

বোধ হয় এই রুচিবিকারের সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোথাও সংযোগ আছে। মধ্যবিত্তের প্রেম জৈব কামনা-বাসনার সীমায় আবদ্ধ, প্রেমের শুচি-শুভ্র-শান্ত আদর্শের সঙ্গে এ-জাতীয় চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নেই, পরিচয়ও নেই। যে জীবন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সতত-নিয়োজিত, জীবিকানির্বাহের তাড়নার দ্বারা নিরন্তর পীড়িত, সেই জীবনের পরিকল্পনার মধ্যে প্রেমের একটি মাত্র রূপেরই প্রকাশ ঘটতে পারে—রক্ত-মাংসের দাবিযুক্ত স্থূলতামণ্ডিত প্রেম। এই জীবনে অনাবিল শান্ত-শুদ্ধ-প্রেম চর্চার পরিবেশও নেই, অবকাশও নেই। জীবনের পরিমণ্ডলের মধ্যে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আর অবসরের হাওয়া না বইলে বোধ করি ইন্দ্রিয়জ প্রেমকে অতীন্দ্রিয় প্রেমের স্তরে উন্নীত করা

সম্ভব হয় না। যেখানে ভোগসুখ পরিতৃপ্তির উপকরণ পর্যাপ্ত ও না-চাইতেই লভ্য, সেইখানেই ভোগবাসনাকে অতিক্রম করা সহজ। বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত জীবনের স্তরে এইরূপ ত্যাগ বা সংযমের ধারণা অনুপস্থিত। সেই কারণেই মধ্যবিত্তের রচিত সাহিত্যে এত কাম-বিকারের চিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। যে সমাজ ভোগের অতৃপ্তির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সমাজ অতীন্দ্রিয় প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করবে কিরূপে? স্থূল জৈব কামনা-বাসনার বন্ধন অতিক্রম না করলে কি প্রেমের সমুন্নত শুভ্রোজ্জ্বল রূপের মুখোমুখি হওয়া যায়?

মনে হয় এইটিই প্রধান কারণ, যার জন্য মধ্যবিত্ত সাহিত্যে প্রেমের আভিজাত্যময় রূপের বর্ণনার অসদ্ভাব। এ-সাহিত্যের আস্টেপৃষ্ঠে স্থূল জৈব কামনা-বাসনার ক্লেদ জড়িয়ে আছে। যেহেতু এখনকার অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত স্তর থেকে উদ্ভূত, সেই কারণে প্রেমের মধ্যবিত্ত ধ্যান-ধারণার অক্টোপাস বন্ধন এড়ান এঁদের পক্ষে প্রায়শঃই সম্ভব হয় না। আর তারই জন্য তাঁদের সাহিত্যে এত মন-জানাজানি মন-দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষের ছড়াছড়ি। এ চাওয়া-পাওয়া আর কিছু নয়, জৈব সুখ আকাঙ্ক্ষা ও তার নিবৃত্তির তাড়না মাত্র। প্রেমের উদ্বর্তিত (sublimated) সমুন্নত রূপের সঙ্গে এঁদের সারা জীবনেও পরিচয় ঘটবার অবকাশ হয় না। তাঁদের ভাবনা-কল্পনা দেহের স্তরে আটকে আছে, সুতরাং তাঁদের সাহিত্যে দেহবাদের এত আধিপত্য। হ্যাঁ, 'দেহবাদ'ই এঁদের সাহিত্যকে বিশেষিত করবার একমাত্র উপযুক্ত অভিধা। দেহকে বাদ দিয়ে এঁরা যেন কিছু ভাবতেই পারেন না। বর্তমান লেখকদের মজ্জাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বরূপের জন্যই যে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের এই চেহারা তা আশা করি আর বিশদ বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

তাই বলে এসব কথা বলার মানে এ নয় যে আমরা বর্তমান

সাহিত্যের গণতান্ত্রিক আদর্শকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে পুরাতন বনেদিয়ানার যুগে ফিরে যেতে চাই। পরশ্রমপুষ্ট পরগাছা বনেদিয়ানার যুগ শেষ হয়েছে, ইতিহাসের এক কৃষ্ণ অধ্যায়ের অবসান হয়েছে। যে আভিজাত্যের উপর আমি জোর দিয়েছি তা আর্থিক বা অর্থনীতিগত আভিজাত্য নয়, রুচির আভিজাত্য, অনুভূতির আভিজাত্য। আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখব, জনজীবনের মাহাত্ম্যের কীর্তন করব, কিন্তু সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেব না। রুচিতে আমরা হব অভিজাত। আমাদের ভাবকল্পনা ও ভাষাকে আমরা যথার্থ আভিজাত্যের দ্বারা মণ্ডিত করে তুলব। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্থূলতার কিংবা গতানুগতিকতার কোন স্পর্শ থাকবে না। এইভাবে গণতন্ত্রকে যদি আমরা রুচির আভিজাত্যের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে এনে মেলাতে পারি তবেই আমাদের একালীন সাহিতচর্চা সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠবে, নচেৎ নয়। জনজীবনের আদর্শের সঙ্গে রুচির সম্মেলন হোক।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আর একটি যে-আলোচনা স্বতঃই অপরিহার্য হয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আভাস দিচ্ছি। আলোচনাটি সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত।

সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির একটি বড় বিভাগ। সমাজজীবনে সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদা সবিশেষ স্বীকৃত। বস্তুতঃ বাঙালীর সমাজে সাহিত্যের কৌলীন্য বুঝি অন্য সব-কিছুর উপরে। আমরা বাঙালীরা সাহিত্যকে যত ভালবাসি এমন বোধকরি আর কোন কিছুকেই নয়। সাহিত্য নিয়ে আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। বাঙালী অন্যান্য বিভাগেও কৃতিত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু তার সকল কৃতিত্বের সেরা কৃতিত্ব বোধহয় সাহিত্যকে অবলম্বন করে। সাহিত্যে উৎকর্ষের জন্য বাঙালীর গর্ববোধ অসাধারণ।

কিন্তু সাহিত্যকে নিয়ে এত যে আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা গৌরব-বোধ, আমরা কখনও ভেবে দেখেছি কি সাহিত্য থেকে আমরা যথার্থ কী বস্তু লাভ করি? সাহিত্য কি শুধুই আমাদের চিত্তবিনোদনের খোরাক জোটায়, আমাদের অবসরের মুহূর্তগুলিকে হাল্কা আমোদে ও আনন্দে ভরে তোলে? না কি সাহিত্য আমাদের সত্তারও উজ্জীবন ঘটায়, আমাদের মনপ্রাণকে মহৎ ভাবাবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তোলে? সাহিত্য থেকে আমরা কী চাই? হাল্কা আনন্দের উপকরণ, না কি যাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের গোত্রবদল হয়, আত্মার রূপান্তর ঘটে, তেমন কোন মহতী বাণীর আশ্বাস? আমরা কি সাহিত্যে শুধুই জীবনের নিখুঁত রূপায়ণের আলেখ্য প্রত্যক্ষ করে তৃপ্ত থাকব, না কি সাহিত্য থেকে তারও বেশী কিছু প্রত্যাশা করব? প্রত্যাশা করব আমাদের চলার পথের নির্দেশ, সঙ্কটে আলো, আত্মোন্নয়ন আর আত্মোপলব্ধির অসংশয় সংকেত-বাণী? আমরা কে কী ভাবে সাহিত্যকে দেখি তারই উপর নির্ভর করে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে গৌরবের ধারণায় তারতম্য।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, সাহিত্য নিয়ে এত যে আমাদের ঘটাপটা মাতামাতি, তা প্রথমোক্ত কারণের জন্য; শেষোক্ত হেতু নয়। আমরা সাহিত্যকে প্রধানতঃ আমোদ আহরণের ক্ষেত্র বলে মনে করি। যে-সাহিত্য নিছকই পর্যবেক্ষণনির্ভর, যে-সাহিত্য কেবলমাত্র কাহিনী বয়ন আর কাহিনী পরিবেশন করেই ক্ষান্ত, যে-সাহিত্য জীবনের ঘটনাবলীর নিখুঁত ফোটোগ্রাফী উপহার দিয়ে বলে, 'নাও, যথেষ্ট দেওয়া হল, আর কিছু আমার কাছ থেকে আশা কোরো না,' তেমন সাহিত্যের প্রতিই আমাদের পক্ষপাত সমধিক ন্যস্ত বলে মনে হয়। কিন্তু যে-সাহিত্য কাহিনী উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মাকেও সঞ্জীবিত করে, আমাদের সত্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, আমাদের অন্ধকার জীবনের পথে আলোকবর্তিকা তুলে ধরে, আমাদের

শোকে সান্ত্বনা, নৈরাশ্যে বল, সারল্যে সন্তোষ বহন করে, আমাদের কর্মস্পৃহাকে উদ্দীপিত করে অথচ আমাদের প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে সংযত করে, আমাদের শান্ত স্থির সুমার্জিত হবার শিক্ষা দেয়—তেমন সাহিত্যকে কি সত্যই আমরা মনেপ্রাণে চাই? আমরা যে বাঙালীরা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য শ্লাঘা অনুভব করি, সে কি এই শ্রেণীর উচ্চসাহিত্যের জন্য, না কি হাল্কা-চটুল রম্যতাধর্মী অবকাশরঞ্জনী সাহিত্যই আমাদের সকল উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস?

সব দেখে-শুনে আমার কেমন যেন মনে হয়, সাহিত্যকে আমরা একটা অবকাশরঞ্জনী বৃত্তি বলেই প্রধানতঃ ধরে নিই। সাহিত্য থেকে আমাদের প্রত্যাশাও তদনুরূপ খাতে চালিত হয়। আমরা বেশীর ভাগ মানুষ সাহিত্য থেকে যেমন খোরাক আশা করি তেমন খোরাকই তার কাছ থেকে পাই। পাঠক-সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল সাহিত্য থেকে ভিন্নতর উপাদানের আশা করে। ভিন্নতর ও উচ্চতর। সত্যি কথা বলতে কি, পাঠক আমার কটুভাষিতা ক্ষমা করবেন, আমরা সিনেমা ফুটবলখেলা আধুনিক গানের জলসা ইত্যাদি বস্তুকে যে-চোখে দেখে থাকি, আমাদের অধিকাংশেরই চক্ষে সাহিত্য সেই-জাতীয় একটি ব্যাপার। কলেজের ছেলে-ছোকরা পড়ুয়া, গল্প-গেলার আগ্রহে বাছ-বিচারের তোয়াক্কা-না-রাখা তরুণী পাঠিকা, সওদাগরী আপিসের কেরানী আর মধ্যবিত্ত পরিবারের আধা-লেখাপড়া জানা গৃহিণী ও বধূ—এঁরাই হলেন সাহিত্যের মুখ্য ভোক্তা, পৃষ্ঠপোষক-পোষিকা। এই পৃষ্ঠপোষণের রূপ থেকেই বাংলা সাহিত্যের রূপটিকে ধরতে পারা যায়। পৃষ্ঠপোষকদের স্বরূপ সাহিত্যের স্বরূপেরও নিঃসংশয় নিশানা।

তালিকায় যে-শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার উল্লেখ করা হল, তাঁদের খাটো করা আমার অভিপ্রায় নয়,—জীবনে বড়-ছোট, অধিক-জানা কম-জানা, বিচক্ষণ-অবিচক্ষণের তফাৎ থাকবেই, এক শ্রেণীর মানুষের অনগ্রসরতার

প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেই তাঁরা হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যান না, আমি শুধু এখানে আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতির কথাই বলছি। আমরা সাহিত্যকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, সাহিত্যের কাছে আমাদের কী প্রত্যাশা—সেই প্রসঙ্গটির উপর জোর দেবার জন্যই এত কথা বলা। সাহিত্য আমাদের নিকট রম্যতা চর্চার, সস্তা অবসর বিনোদনের এক মহা শ্রীক্ষেত্র। তা-ই যদি না হবে, তা হলে সাম্প্রতিক বাংলা ভাষায় এত হাল্কা গল্প-উপন্যাস, এত রম্যরচনা, এত সচ্ছল মধ্যবিত্তের ভ্রমণসুখ-কণ্ডুয়নকারী বিলাসী ভ্রমণ-কাহিনী, এত সিনেমার গল্প, ডিটেক্‌টিভ গল্প, রোমাঞ্চ-রহস্য-কাহিনীর ছড়াছড়ি কেন? স্থূল ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক চটুল সিনেমা-পত্র পত্রিকাগুলি সাহিত্যের বাজার জাঁকিয়ে বসেছে কেমন করে? ভাল বই চিন্তাপূর্ণ বই মহৎ ভাবোদ্দীপক বই প্রকাশকের দোকানে গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে, এদিকে অবধূত আর নীহার গুপ্ত আর অন্যান্য সস্তা লেখকদের বই বাজার ছুঁতে না ছুঁতেই বিক্রি হয়ে যায় কী প্রকারে? প্রথম-নামীয় লেখকের বইয়ের এই-যে ব্যাপক পঠন-পাঠন আমাদের সাহিত্যে চলছে, এ কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে এই কথাই যে, আমাদের একালীন পাঠক-সম্প্রদায়ের উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, আমরা জেনে-শুনেই আমাদের রুচিকে নিম্নগামী করে তুলেছি। অবধূতের পরিবেশিত উগ্র ঝাঁঝালো যৌন-'কাম'-বীভৎস রসের প্রতি সমাজের গুণী, অগুণী সকল স্তরের পাঠকের সমান পক্ষপাত বর্তমান সমাজের প্রচণ্ড শূন্যগর্ভতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। এ একটি সাংঘাতিক অবক্ষয়ের (decadence) অবস্থা। এ রকম ভয়াবহ মূল্যাপকর্ষ তখনই ঘটে যখন সমাজ ধ্বংসের কিনারায় এসে উপনীত হয় এবং ওই ধ্বংসের সমাধির উপর নূতন সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমরা যে একটা ক্রান্তির (transition) অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সে-বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। নয়তো সাহিত্যে এত বীভৎস রসের ছড়াছড়ি দেখেও মানুষ আঁতকে ওঠে না কেন? কোথায় এ-জাতীয় সাহিত্যকে সবাই সমস্বরে ধিক্কার দেবে, তা নয়, তাকে আরও লুফে নেবার জন্য সবাই আগু বাড়িয়ে আছে। রুচির বিকার কত অধঃপাতে আমাদের নামিয়েছে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

সাহিত্যে এই সমস্ত অপলক্ষণের অভিব্যক্তির জন্য আমাদের মজ্জাগত মধ্যবিত্ত প্রবণতাই বিশেষভাবে দায়ী, যার কথা আমি পুর্বে আলোচনা করেছি। মধ্যবিত্ত মন সাহিত্যকে রম্যতা-বিলাস ছাড়া আর কিছু ভাবতে নিজের ভিতর থেকেই বাধা পায়। চটুল মনন মধ্যবিত্ত মনের স্বভাবধর্ম। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা নিম্নবিত্ত তাদের মধ্যে অবশ্য দুঃখ-বেদনার বোধ খুব তীব্র এবং তারা সাহিত্যে সেই-জাতীয় জীবনের রূপায়ণই সচরাচর পছন্দ করে, যে-জীবন তাদেরই দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি বই নয়। কিন্তু সকল স্তরের মধ্যবিত্ত সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে-স্তরে সবিশেষ সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান, তারা এক কিম্ভূত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। হাল্কা গল্প-উপন্যাস তথাকথিত রম্যরচনা ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া আর অন্য বিশেষ-কিছু পড়তে তারা ভালবাসে না। গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও আবার সেই সবে তাদের সমধিক রুচি, যেগুলির কাহিনী যৌনতা-ঘেঁষা বীভৎস রসের গাঁজলা-ওঠা ফেনায় ফেনিল। ওই স্তরের কি পাঠিকা কি পাঠক সকলেরই এক অবস্থা। এই স্তরের 'বিদ্বান' খ্যাতিমান অধ্যাপকদেরও দেখেছি অতি নিম্নস্তরের বইয়ের পোষকতা করতে। তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিদ্যা থাকতে পারে (তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি), কিন্তু তাঁদের সাহিত্যবোধ পলকা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাহিত্যিক ভাল-মন্দের বিচারক্ষমতার কোন অনুশীলন তাঁরা করেন নি বলেই হাতের কাছে যা পান তাই গোগ্রাসে

গেলেন। বৃত্তিজীবী শ্রেণীর (professional classes) প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদের (যেমন কৃতী ডাক্তার, সাংবাদিক, উকিল, দালাল, ব্যাঙ্কার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি) মধ্যে অনেকসময় সাহিত্য সম্বন্ধে আশ্চর্য নিশ্চেতনতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা সাহিত্যের বই পড়েন হয় বাড়তি সময় কাটাবার মাধ্যম হিসাবে, নয় তো প্রতি মানুষের মধ্যেই রূপকথা গল্প ঘটনা সংবাদ ইত্যাদি অনুধাবনের যে মজ্জাগত বাতিক রয়েছে তাতে সুড়সুড়ি দেবার জন্যে। এ শুধু 'গল্প' গেলার জন্যেই বই পড়া। এ-পড়ার মধ্যে নির্বাচনাত্মক ভাল-মন্দের বিচারের কোন প্রশ্ন নেই, এ স্রেফ সময় কাটাবার একটা অছিলা মাত্র। ট্রেনে, স্টীমারে লোকে সময় কাটাবার জন্য যেভাবে হাল্কা বই ম্যাগাজিন পড়ে, এ ঠিক তেমনি পড়া। এ-পড়ার পিছনে অন্তরের গভীর কোন তাগিদ নেই। যে বইয়ের কাহিনী নিছক পর্যবেক্ষণের ফলমাত্র নয়, জীবনের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর প্রতিকৃতি মাত্র নয়, যে-কাহিনীর পিছনে মনন আছে দর্শন আছে উপলব্ধির প্রগাঢ়তা আছে, সে-বই এঁদের আশু ক্লান্ত করে তোলে। পক্ষান্তরে, যে-বই সহজে পড়া যায়, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে যে-বই পড়তে বাধে না, যে বইয়ের মর্ম অনুধাবন করতে শিরদাঁড়া সোজা রাখবার আবশ্যকতা হয় না, তেমন সব বইয়ের প্রতিই যেন এঁদের শোধনাতীত দুর্বলতা। একাধিক কৃতী বা বিচক্ষণ বলে পরিচিত ব্যক্তিকে এমন সব বইয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখি, যে-সব বই সাহিত্যের সামান্য রুচিযুক্ত পাঠক চিমটে দিয়েও ছুঁতে রাজী হবেন না। এ-জাতীয় রুচিহীনতার নজির চাক্ষুষ করে লজ্জাই শুধু পাই নি, দুঃখও পেয়েছি। এসব আমাদের সাহিত্যের বদ্ধমূল আমোদপ্রবণতার অসংশয় প্রমাণ।

সাহিত্য থেকে এই আমুদেপনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে না পারলে সাহিত্যের উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যৌন-বীভৎস-

রম্য-সিনেমা-রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের প্রতি একালীন পাঠকের অতিরিক্ত উৎসাহ তাঁদের আমুদেপনারই প্রকাশ। এই আমুদে-পনার অত্যুৎসাহ খর্ব করে সেই জায়গায় মননশীলতাকে আবাহন করে আনতে হবে। সাহিত্যে অবশ্যই যথার্থ হাস্যরস ব্যঙ্গ নির্মল কৌতুকের স্থান আছে, তাই বলে সস্তা ভাঁড়ামি আর ছ্যাবলামিকে কখনও যেন আমরা হাস্যরস বলে ভুল না করি। যথার্থ হাস্যরস বা হিউমার অতি উচ্চাঙ্গের বস্তু, বাংলা সাহিত্যে খুব মুষ্টিমেয়সংখ্যক লেখকই এই ক্ষেত্রে সত্যিকার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দান সর্বাধিক। আমুদেপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের আরও বেশী করে গভীর-গম্ভীরের অনুশীলন করতে হবে। গভীর-গম্ভীর স্বতঃই গোমড়ামুখো ও dull, এমন মনে করবার হেতু নেই। সাহিত্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ রস ট্রাজিডি, ট্রাজিডির রূপ গভীর-গম্ভীর। বেদনা কখনও চটুলতাধর্মী হয় না, তার ভিতর গাম্ভীর্য অবধারিত ; গম্ভীর রসকে তাঁরাই পানসে বলে মনে করেন ও তা থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করেন, যাঁরা সাহিত্যকে একটা হাল্কা খুশীর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। 'চলতি হাওয়ার পন্থী'দের কাছে সাহিত্যও একটা চলতি হাওয়ার দমকা আলোড়ন ভিন্ন কিছু নয়।

যে কথা বার বার বললেও তার প্রয়োজন ফুরায় না সে কথা পুনরায় বলছি। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলা কথা-সাহিত্য বর্তমানে একান্ত-ভাবে শরৎচন্দ্রের শিল্পাদর্শের খাত বেয়ে চলেছে, ওই প্রবাহের বেগ ও গতি প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। জনপ্রিয়তার খাত থেকে স্রোতের গতিকে ভিন্নমুখী করে তাকে যথার্থ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের খাতে চালিত করতে হবে। যেমন হৃদয়বত্তায় তেমনি মননের ঐশ্বর্যেও সৃষ্টিধর্মিতার লক্ষণ বড় কম লুকিয়ে নেই ; বলাই বাহুল্য নতুন যুগের সাহিত্যে এই

দুই ধর্মেরই একত্র সমাহার ঘটাতে হবে। আমাদের কথা-সাহিত্যকে নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের স্তরে সীমিত রাখলেই চলবে না, তার ভিতর দার্শনিকতার রসেরও সঞ্চার করতে হবে। সাহিত্য জীবনরহস্যবোধের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক। এত-যে গল্প উপন্যাস রম্যরচনা ইত্যাদি লেখা হয় এগুলির অধিকাংশেরই পিছনে মননশীলতার কোন পটভূমি নেই। এসব কথামাত্রসার লেখা, কথার জঞ্জাল বই নয়। এই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারলে সাহিত্যের আবহাওয়া অনেক শোধিত হত। নবভাবে অনুপ্রাণিত নূতনতর সাহিত্যসৃষ্টির পথ তাতে পরিষ্কার হত। কবিতায় এখন শুধু ভঙ্গি আর আঙ্গিকের প্রাধান্য। এও একরকমের আমোদপ্রবণতার পরিণামফলমাত্র। সাম্প্রতিক কবিতার দুর্বোধ্যতা প্রদর্শনবাদী মনোভাবপ্রসূত, যা আমুদেপনারই সামিল। এই আপাতদুর্বোধ্যতার মধ্যে না আছে গাম্ভীর্য না গভীরতা। এইসব আঙ্গিকসর্বস্ব ফাঁপা কবিতার চটক সৃষ্টির পরিবর্তে কবিদের সত্যিকার বিশুদ্ধ ভাবের কবিতা সৃষ্টি করতে হবে। এমন কবিতা, যার ভিতর ভাবের প্রগাঢ়তা আছে অথচ যা আবেগরিক্ত নয়। অনুভূতির গাঢ়বদ্ধতা ও মননের মৌলিকত্ব, এতদুভয়কেই দুইনরী হারের মত আধুনিক কবিতার গলায় দুলিয়ে দিতে হবে। এদিকে আলোচনা-সমালোচনা-প্রবন্ধ-সন্দর্ভ-জাতীয় তথ্য ও চিন্তাপূর্ণ রচনার অধিকতর ও ব্যাপকতর অনুশীলন প্রয়োজন। যে ভাবকল্পনা আমাদের মনপ্রাণকে উদ্দীপিত করে, সঙ্কটে আমাদের আলো দেখায়, আমাদের চিন্তাশক্তিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে, আমাদের ভাবনায় প্রবুদ্ধ করে, তেমন রচনার সংস্কার বাংলা-সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী দৃঢ়প্রোথিত হওয়া আবশ্যক। মনের লীলাবিলাসের প্রয়োজনে সাহিত্যকে ব্যবহার না করে আমরা যেন তাকে আত্মার উন্নয়নে ব্যবহার করি। সাহিত্য আমাদের জীবনবেদে রূপান্তরিত হোক।

॥ সমাজ-সমালোচনা ॥

আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা বলতে আমরা প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনাকে বুঝে থাকি। একেই আমাদের ভাষায় সমালোচনার পরিমাণ ও মান নগণ্য ; তার উপর যে সামান্য সমালোচনাও হয় তা-ও বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনার খাতে প্রবাহিত। আমাদের সাহিত্যে সমাজ-সমালোচনা নেই কেন। তা নিয়ে লেখকেরা মাথা ঘামান না কেন। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি মূলগত ত্রুটি। এই বিচ্যুতির শোধন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কোন ক্রমেই পূর্ণবয়স্ক সাহিত্যের গৌরব দাবি করা চলে না।

সমাজ-সমালোচনা বলতে কী বোঝায় সেটি একটু পরিষ্কার হওয়া মন্দ নয়। সমাজ-সমালোচনা কথাটির মধ্যেই অবশ্য ওই কথার অর্থ বেশ-কিছুটা নিহিত আছে, তাহলেও তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেহেতু এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব নিবিড় নয় সেইজন্যই এই ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণ আবশ্যক। সমাজ-সমালোচনা অর্থাৎ সমাজের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্যায় অবিচার অসংগতির সমালোচনা। যে সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় আমরা বাস করছি তার অন্তর্নিহিত অসাম্য ও বৈষম্য সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বর্তমান সমাজ অন্যায় অবিচার শোষণ ও অত্যাচারে পূর্ণ। বহুর বঞ্চনার ভিত্তির উপর কতিপয় সুবিধাভোগীর অপরিমিত ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাকার উত্তুঙ্গ করে বর্তমানের প্রমত্ত সমাজ অস্থির পদক্ষেপে অনিশ্চিত গতিতে সম্মুখে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। যে কোন মুহূর্তে এই নড়বড়ে ইমারত তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। সমাজের

এই অস্থির স্বরূপ সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত, অথচ এই ঐক্যমতের প্রতিফলন সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। কথা-সাহিত্যিক ও কবিরা তবু বরং অনেক সময় তাঁদের লেখায় সমাজের নানাবিধ বিচ্যুতির প্রতি পরোক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, কিন্তু সমালোচকশ্রেণী এই বিষয়ে প্রায়-নীরব। তাঁরা তথাকথিত সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু সমাজ-সমালোচনায় কারও বড় একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের সাহিত্যের প্রকাশনা-জগতে মাসে মাসে প্রায় নিয়মিত ভাবেই সমালোচনার বই প্রকাশিত হচ্ছে। এই সকল গ্রন্থের শ্রেণীস্বরূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের শতকরা নিরনব্বুইটি বই-ই সাহিত্যের কোন-না-কোন দিক বা বিভাগের আলোচনা। অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকারের আলোচনা। সমাজ-সমালোচনামূলক রচনা-সংবলিত গ্রন্থ খুব কমই চোখে পড়ে। আদৌ চোখে পড়ে না বললেই বোধ করি পরিস্থিতির সত্যকার বর্ণনা করা হয়। সকল মানুষেরই বোধ হয় কোন-না-কোন বিষয়ে বর্ণান্ধতা-জাতীয় দুর্বলতা আছে। আমারও আছে। আধুনিক সমাজের পটভূমিতে, যখন পুরাতন অবস্থা-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়ে গেছে, এই বিশেষ সামাজিক কাঠামোয় কেউ যখন প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরস ভাব বিভাব ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যান ফেঁদে প্রমাণ-সাইজ বই লেখেন, আমার খুন চেপে যাবার মত অবস্থা হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মহিমা খর্ব করবার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি না, এ কথা বলছি এই যুগ এবং পুরাতন যুগের মধ্যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান তাকে পরিস্ফুট করবার জন্য। কী হবে এই কালেজীয় অধ্যাপক-সুলভ ধ্বনি রস ইত্যাদির ফেনায়িত বর্ণনায়, যদি না ওই সব সূত্রের ফলিত প্রয়োগের বিদ্যার সঙ্গে আলোচকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে? সাহিত্যসমালোচকেরা পুরাতন আলঙ্কারিকদের উদ্ধৃতি উৎকলন করে নবরসের ব্যাখ্যানে

তৎপর, এদিকে আধুনিক সাহিত্যের কোনও গ্রন্থকারের রচনাবলীর ভিতর কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ কোন্ রসের প্রয়োগ হয়েছে সে সম্বন্ধে চেপে ধরলে আমি জোর করে বলতে পারি এই জাতীয় অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচকই নিরুত্তর বনে যাবেন। এ রকম ফলিত জ্ঞানবর্জিত সাহিত্যাদর্শ বিশ্লেষণের সার্থকতাই বা কোথায়, প্রয়োজনটাই বা কী!

সমসাময়িক সমাজের এত-এত প্রতিকারহীন অন্যায় অবিচার অসাম্য লেখকদের মনোযোগ যাজ্ঞা করে বেড়াচ্ছে, সেদিকে কারও মন নেই; সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের বর্ণন করতে, কিংবা শরৎ-সাহিত্যে নারী বা বঙ্কিম-সাহিতে হাস্যরস বা ঐজাতীয় অন্য কোন বই লিখতে; কোন এক সাম্যতন্ত্রী লেখক সম্প্রতি কালিদাসের কাব্যে কতপ্রকার ফুলের বর্ণনা আছে তাই নিয়ে পত্রান্তরে সবিস্তার গবেষণা করেছেন। তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপজীব্য বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রমাণ নেই, এদিকে কালিদাসের কাব্যে ফুলের শত কাহন বর্ণনা। কলাকৈবল্যবাদী অস্কারওয়াইল্ড একদা শেক্সপীয়রের নাটকে কত রকমের পোশাকের বর্ণনা আছে তার ফিরিস্তি দাখিল করে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ-ও অনেকটা সেই জাতীয় ব্যাপার। এ মজ্জাগত বুর্জোয়া প্রবণতা তথা সমাজ-অচেতনতারই দ্যোতক। এ রকম বিষয় নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের সামাজিক অসংগতি ও অন্যায় যে খুব বেশী পীড়া দেয় তা মনে হয় না। মুখে বামপন্থী রাজনৈতিক তন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করলে কী হবে, আসলে মনটি যে পড়ে আছে তথাকথিত চাঁদের হাসিতে, ফুলের মেলায়, নদীর কলতানে আর পাখির গানে। এরকম মানুষকে যে অরূপ-লোকের ভাবে-ভোলা সৌন্দর্যের তানে পরিপূরিত বাঁশীর মনমাতানো সুর হাতছানি দিয়ে ক্রমাগত ডেকেই চলেছে, সমাজের দিকে দু চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে দেখবেন তার অবসর কই! মজ্জাগত বুর্জোয়া শ্রেণীচৈতন্যসম্পন্ন মানুষেরা যখন

ফ্যাশানের বশবর্তী হয়ে সমাজতন্ত্রে বা সাম্যতন্ত্রে বিশ্বাস ঘোষণা করেন তখন এরকম বিসদৃশ অবস্থারই উদ্ভব হয়।

সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্য বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছি তা দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের দ্বারা এবার পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করব। আমাদের দৈনিক ও অন্যান্য ধরনের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সমাজের কুসংস্কার মূঢ়তা ও অপরাপর গলদ সম্পর্কে আলোচনা না হয় এমন নয়। কোন কোন রাজনৈতিক লেখককেও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে ও-জাতীয় বিষয় অবলম্বনে ছোট ছোট পুস্তিকাও (pamphlet) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর সবই টুকরো-টুকরো রচনা। আর তা ছাড়া এসব রচনায় সাহিত্যের সৌন্দর্য প্রায়শঃ থাকে না। স্থতরাং এগুলিকে সমাজ-সমালোচনা-সাহিত্যের পরিধিভুক্ত করা চলে না। সাময়িক পত্রাদিতে অর্থাৎ সাহিত্যের মেখলায় হয়তো কিছু-কিছু সমাজ-সমালোচনামূলক রচনার দেখা মেলে, কিন্তু খাস সাহিত্যের এলাকার ভিতর সমাজ-সমালোচনার পরিপ্রকাশ কোথায়। আমরা যে সবাই বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পান করে নেশায় বিভোর শিবনেত্র হয়ে আছি, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির দিকে চোখ মেলে তাকাবার আমাদের অবসর কই। কাব্যমীমাংসা, ধ্বনিবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে নামরস, প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে রূপ-সনাতন, মঙ্গলকাব্যে লৌকিক আচার, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু ও উপনিষদের বাণী. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রম-বিকাশ, বাংলা লিরিকের ধারা ইত্যাদি বিষয়ক রচনা লিখতে আমাদের কলম চুলবুলিয়ে ওঠে; এদিকে ইংরেজ শাসনের আওতায় গত দু শো বছরে আমাদের সমাজের কী কী পরিবর্তন হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সূত্র ধরে আমাদের জাতীয় জীবনে কী কী অন্যায় ও বিজাতীয় অভ্যাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষণের প্রকৃত রূপ ও ধারা-ধরন কী, অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণে জাতীয়

শক্তির কী পরিমাণ অপচয় ঘটছে—এসব বিষয়ে পাঠকসাধারণকে সচেতন করবার মত লেখক আমাদের সমালোচকশ্রেণীর মধ্যে মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা যদি এসব সম্বন্ধেই অবহিত হব তবে নবরসের ব্যাখ্যান করবে কে, বাউল গানে সহজিয়া তত্ত্ব বা তন্ত্র-সাহিত্যের ভূমিকা কে লিখবে?

বলা হবে, অভীপ্সিত বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের এলাকার বিষয়, সমাজবিজ্ঞানী লেখকেরাই সে সবের আলোচনা করবেন। সাহিত্যের বিষয়ের সঙ্গে এসব প্রসঙ্গকে গুলিয়ে ফেলার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না। আজ্ঞে না মহাশয়, লিখতে জানলে এসব বিষয়কেই উপযুক্ত সাহিত্য-সম্মত রীতিতে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন সাহিত্যের বড় বড় লেখকেরা তা করেও গেছেন। ফরাসী সাহিত্যের ভলতেয়ারের কথা স্মরণ করুন। আঠার শতকের এই বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রতিভাশালী সমাজ-সমালোচক লেখক ফরাসী রাজতন্ত্র যাজকতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও এই তিন তন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গোটা জীবন অক্লান্ত লেখনী পরিচালনা করে গেছেন। ফরাসী বিপ্লবের তিনিই হলেন অন্যতম প্রধান অগ্র-পুরোহিত। ভলতেয়ার রাজনৈতিক পুস্তিকালেখক (political pamphleteer) মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অপিচ কবি ঐতিহাসিক গবেষক বিজ্ঞানী। সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আমৃত্যু আপোযহীন সংগ্রাম। অন্যায়-অসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। আর এই সাংগ্রামিকতা আর অসহিষ্ণুতাকেই তিনি দীর্ঘ জীবনের সাধনায় সার্থক সাহিত্যরূপ দিয়ে গেছেন। তিনিও সমালোচক ছিলেন, ক্রুবাদুরদের প্রেমগীতি বা মধ্যযুগীয় ফরাসী কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞোচিত আলোচনায় আত্মনিয়োগে তাঁর পক্ষে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তা না করে তিনি সমাজ-সমালোচনায় তাঁর লেখনীর শক্তিকে মুখ্যতঃ

নিয়োগ করতে গেলেন কেন। তাঁর সময়ে ওইটেই সমধিক জরুরি ছিল বলে। আমাদের জরুরি-অজরুরি বোধ নেই। এই ডিফিল-ডিগ্রি-কণ্টকিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের তকমা-আঁটা অধ্যাপকশাসিত বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এলাকায় তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার বান ডেকেই চলেছে, সমালোচনার এই সমাজমূলহীন অসার ভাবোচ্ছ্বাস প্রতিরুদ্ধ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। আমরা তো সমালোচনার জন্য সমালোচনা করি না, কোন গতিকে স্বীয় অস্তিত্ব সপ্রমাণ করবার জন্য সমালোচনার দ্বারস্থ হই। আমাদের মুখ্য লক্ষ্য তথাকথিত ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন এবং এই অভিপ্রায়ে যা-হোক তা-হোক একটা সাহিত্য-সম্পর্কিত বিষয় নির্বাচন করে তাতে লেগে পড়া। অন্তরের তাগিদের কোন কথা এর মধ্যে নেই, বস্তুতঃ অন্তরের তাগিদই এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অবান্তর বিষয়। বলা বাহুল্য, এই পথে চলে কিতাবী সমালোচক হয়তো হওয়া যায়, প্রকৃত সমালোচক হওয়া যায় না। যে-কোন বিষয় অবলম্বনে—তা সে বিষয় সাহিত্যসংক্রান্তই হোক আর সাহিত্যেতর প্রসঙ্গাবলম্বীই হোক—গবেষণায় আত্মনিয়োগে মস্তিষ্কচর্চা হয়তো কিছু হয় এবং সেই চর্চার মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু শুধু মস্তিষ্কচর্চার জন্যই আমরা মস্তিষ্ক চর্চা করি না, তার সামাজিক উপযোগিতারও সন্ধান করি। যে মস্তিষ্কজীবিতার দ্বারা শুধু মস্তিষ্কেরই অনুশীলন হয় এবং মস্তিষ্কের স্তরেই যা সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজ-মনের উপর যার ছাপ পড়ে না, তেমন মস্তিষ্কজীবিতার সার্থকতা কিছু থাকলেও তাকে খুব উঁচুদরের সার্থকতা বলা যায় না। সমাজভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে সমালোচনায় অগ্রসর হতে আমাদের অনাগ্রহ অতি স্পষ্ট। বোধ হয় এটি আমাদের জাতিগত একটি বিচ্যুতি। নইলে বাংলা সাহিত্যের এত এত দিকে এত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, আজও

এই দিকটির অপূর্ণতার শোধন হল না কেন। এটি যে আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভলতেয়ারের কথা হচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যে ভলতেয়ারের মেজাজের লেখকের আবির্ভাব হয় নি এটি আমার একটি স্থায়ী আক্ষেপ। যে দুই-একজন শক্তিমান লেখকের মধ্যে অনুরূপ প্রবণতার প্রমাণ পাই তাঁরাও শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমালোচনার শক্তি সমাজের খাত থেকে প্রত্যাহার করে সাহিত্যের খাতে পরিচালিত করেছেন। এরকম মেজাজবিশিষ্ট লেখকের ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান লক্ষণই হল স্থিতাবস্থার (status quo) সঙ্গে অসহযোগ ও কায়েমী স্বার্থবানদের প্রভাব এড়িয়ে চলা। শাসক শক্তির সঙ্গেও এঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই দুই শর্ত পরিপূরণকারী সমালোচক আমাদের মধ্যে কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। ভলতেয়ার অবশ্য বছর দুই প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের দরবারে ছিলেন, কিন্তু রাজার পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হয় নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণী-স্বার্থ ই শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য করে তুলল। ভলতেয়ার জেসুইট বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই জন্য ব্যক্তিজীবনে জেসুইটদের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ মমত্ব ছিল ; কিন্তু তাঁর আদর্শগত বিশ্বাস তার দ্বারা বিচলিত হয় নি। তিনি আমরণ রাজতন্ত্রের দক্ষিণহস্ত যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। যাজক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অন্যায়-অত্যাচারের এত বড় সাহিত্যিক প্রতিরোধ-কারী বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় দেখা দেয় নি।

কিন্তু এ সকল আদর্শ আমাদের সমালোচকদের সামনে তুলে ধরা বৃথা। আমাদের সমালোচকেরা যদি সাহিত্যসেবাশ্রয়ী হয়ে সংগ্রামের পথেই যাবেন তবে ভাব ও বিভাবের বিশ্লেষণ কে করবেন, কাব্যালোক কে রচনা করবেন, শাক্ত পদাবলীর ইতিহাস কে বিবৃত করবেন। যত

সব নিরামিষভোজী জার্ড্যকবলিত অধ্যাপক আর সৌন্দর্যবাদী ঘরানার ব্যাখ্যাকার মিলে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে খানা-ডোবায় পরিণত করে তুলেছেন; এই সাহিত্য-পল্বলের ভিতর সমুদ্রের বজ্রনির্ঘোষ আশা করাই বাতুলতা। ভলতেয়ার তো কোন্ ছার, ইংরেজী সাহিত্যের এ্যাডিসন সুইফট ডিফো গোল্ডস্মিথ যে ধারার গদ্যরচনার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার ছিটেফোঁটা সাদৃশ্যাত্মক রচনারও দেখা মিলবে না বাংলা সাহিত্যে। বাঙালী পাঠক বার্নার্ড শ'র সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত এইরূপ শুনে আসছি। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলির বাইরে ভারতবর্ষে শ'য়ের বইয়ের যেরকম কাটতি এরকম নাকি আর কোন দেশে নয়। বিশেষতঃ বাংলা দেশে শ'-প্রীতির তুলনা নেই। এ কথার কার্যকরী প্রমাণ পাই নে। বাংলা দেশের ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠক মহলে শ'-সাহিত্যের যদি সমাদরই হবে তবে তাঁদের সেই চাহিদার তীব্রতা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয় না কেন। সেখানে ভেষজাশ্রয়ী সমালোচনা-সাহিত্যের এত প্রাধান্য কেন। সমাজ-অচেতন সাহিত্যই বা সেখানে এত আদৃত হয় কেন। রম্য, বীভৎস আর যৌন সাহিত্য সেখানে আধিপত্য করে কোন্ যুক্তিবলে? অর্থনীতির একটা প্রধান সূত্র হল চাহিদার অনুরূপ যোগান। এ কথা সাহিত্যের বেলায়ও সমান খাটে। বাঙালী পাঠকের উপর 'শেভিয়ানিজমের' প্রভাব কিছুমাত্রও যদি সত্য হত এবং তাঁর চাহিদা তদনুরূপ খাত বেয়ে চলত তা হলে সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টিধারায় সমাজ-সমালোচনার কিছুটা অন্ততঃ প্রাবল্য আমরা লক্ষ্য করতুম। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নৈরাশ্যকর। শ'য়ের ভেকধারী একজন সুলেখক আমাদের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু তাঁর লিখনশক্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিবেদন করেই বলছি, শ'য়ের মনোভঙ্গী থেকে তিনি সহস্র যোজন দূরে আছেন। তাঁদের দু জনার মধ্যে মেরুর ব্যবধান

বললেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র-ঘরানায় পুষ্ট হয়ে কখনও যথার্থ সমাজ-সমালোচক হওয়া যায় না, সে কথা বলা দরকার।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সমাজ-সমালোচক লেখক হয়েছেন গুটি কয়। তাঁদের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-সমালোচক মনের অসংশয় সাক্ষ্যে পূর্ণ। সে সাক্ষ্য অতীব শক্তি-লক্ষণাক্রান্তও বটে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি সনাতন ভাবধারার সঙ্গে রফা করে চলেছিলেন, খাঁটি সমাজ-সমালোচক লেখকের মত বৈপ্লবিকতায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ও পরে তাঁর সমসময়ে যে-সব লেখকের রচনার মধ্যে আমরা সমাজ-সমালোচনার নিদর্শন পাই তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' 'সমূহ' প্রভৃতি গ্রন্থরচনার পর্বে সমাজ-সমালোচনামূলক মনোবৃত্তি প্রকট হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সৌন্দর্যায়ণ ও মরমীবাদের আধিক্যে সে প্রবৃত্তি কেমন যেন জুড়িয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় সমাজ-সমালোচনা অতি স্পষ্ট। তার পরের যুগের লেখকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় এই প্রবৃত্তির কমবেশী প্রস্ফুরণ ঘটেছে তাঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্য বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। সমসাময়িক সাহিত্যে এই ক্ষেত্রে আরও যে কজন রচনানিরত আছেন তাঁরা হলেন—প্রমথনাথ বিশী, 'বনফুল,' পরিমল গোস্বামী, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, অ. কৃ. ব., সম্ভবতঃ আরও কেউ কেউ।

তবু বলব, সাহিত্যে এই ধারার রচনার যেটুকু অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এখনও আমাদের সাহিত্যে যথার্থ মসাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্যের বিকাশই হয় নি বলতে গেলে। ইউরোপীয় সাহিত্যোচিত সমাজ-সমালোচনার ধারা-ধরন আমাদের আজও বিধিমতে রপ্ত হয় নি এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। ও জিনিস আমাদের ধাতেই যেন নেই। যে অর্থে ভলতেয়ার সমাজ-সমালোচক, বার্নার্ড শ' সমাজ-সমালোচক, সে অর্থে সমাজ-সমালোচক আমাদের মধ্যে এখনও আবির্ভূত হন নি। এই বৈষ্ণব-ভাবাকুলতা আর গদগদ ভাষের দেশে নিরবচ্ছিন্ন সমাজ-সমালোচকের কল্কে পাওয়া সহজ নয়। সমাজ-সমালোচক রূপে যদি কেউ লেখনী চালনা করতে চান, তা হলে লেখকেরাই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে জাতে পতিত করবেন, অন্য কোন প্রতিকূলতার প্রয়োজন হবে না। খবর-কাগুজে আর সিনেমা-পত্রিকাশ্রয়ী লেখকদেরই এখন বাংলা-সাহিত্যে আধিপত্য। পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার কথা আর না-ই বা বললাম। অথচ সাহিত্যে এ-জাতীয় সমালোচনার খুবই প্রয়োজন আছে। আর কিছুর জন্য না হোক বাংলা সাহিত্যের মজ্জাগত রোমান্টিকতাকে খর্ব করবার জন্যই এ জিনিসের প্রয়োজন অবিসম্বাদী।

উপরে যে নাম-তালিকা সংকলন করা হল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী লেখকের সংখ্যাই বেশী, পেশাদার সমালোচক খুব কম জনাই আছেন। আমাদের পেশাদার সমালোচকেরা এ সব ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা বা শরৎ-সাহিত্যে পল্লী জাতীয় রচনা বিস্তারে পটু। তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী, তাঁদের মনোভাবও তদনুরূপ। তাঁদের সমালোচনা তাঁদের অধ্যাপনা বৃত্তিরই রকমফের মাত্র। ক্লাসে ছাত্রদের কাছে যে সব জিনিস ওগরান সেগুলিকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে সমালোচনা নামে প্রকাশ করেন।

এঁরা সব জীবিত ও মৃত সৃষ্টিধর্মী লেখকদের বশম্বদ সেবক, নিজ যোগ্যতাবলে স্বভূমির উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান আত্মপ্রত্যয়শীল লেখক নন। তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের ধ্বজাধারী সমালোচক এঁরা। কিতাবী রীতিনীতিতে এঁদের আস্থা, মৌলিকতার আদর্শে নয়। নিজের মাথা খাটিয়ে এক কলম লিখতে জানেন না, এদিকে আলঙ্কারিক-কথিত নবরসের ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণে পঞ্চমুখ। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার পরিমাণ কমে গিয়ে সমাজ-সমালোচনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সাহিত্যের হিত বই অহিত হত না।

॥ ভাষাভিত্তিক সমালোচনা ॥

সাহিত্যের সমালোচনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। কেউ সাহিত্যস্রষ্টার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটিকে মূল বিচার্য বলে মনে করেন ; কেউ তাঁর জনরঞ্জিকা শক্তির উপর সবিশেষ জোর দেন। আজকালকার সমালোচনায় ভাষার প্রশ্নটির উপর বিশেষ মনোযোগ আরোপের এক নূতন অভ্যাস দেখা দিয়েছে প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই। বিশেষতঃ ইউরোপের এক শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে এই অভ্যাস খুবই বলবৎ হয়ে উঠেছে। এই বিশেষ রীতির সমালোচনাকে আমরা ভাষাভিত্তিক সমালোচনা আখ্যা দিতে পারি।

এই রীতির সমালোচনায় সব ছাড়িয়ে ভাষাই প্রধান বিচার্য বিষয়। এবং লেখকের গুণাগুণও নির্ণীত হয় প্রধানতঃ এই মানদণ্ডের দ্বারাই। ভাষাকে যাঁরা সাহিত্যকর্মের নিছক বহিরঙ্গ বলে মনে করেন, এই শ্রেণীর সমালোচক তাঁদের সঙ্গে একমত নন। এতকাল সাহিত্যবিচারে তথাকথিত 'স্টাইলের' উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়ে এসেছে, এঁদের মতে সেই স্টাইল আর কিছু নয়, ভাষারই বিদেহী রূপ। স্টাইলের ভিতর লেখক-ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ হয়ে থাকে, ভাষার ভিতরও তা-ই ; শুধু তফাতের মধ্যে এই যে, ভাষারীতিকে চোখে দেখা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়, অন্য ভাষারীতির সঙ্গে তুলনায় তার ভাল-মন্দ নির্দেশ করা যায় ; স্টাইল বস্তুটি অনির্দেশ্য অনির্ণেয় অব্যাখ্যেয়, তাকে শুধু অনুভব করা যায় তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া যায় না। একজন লেখক উৎকৃষ্ট স্টাইলের অধিকারী বললে বুঝতে হবে তাঁর লেখার ভিতর তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সৌরভ পরিকীর্ণ হয়ে আছে ; কিন্তু সেই বিশিষ্ট বস্তুটি যে কী

তা অনুভববেদ্য হলেও তাকে প্রকাশগম্য করে তোলবার উপায় নেই।

এই দিক দিয়ে ভাষার অনেক সুবিধা। ভাষাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করা যায়, তার বর্ণনা দেওয়া যায়। ভাষাও স্টাইলের মত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। স্টাইলে ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতম, পরিস্রুততম অভিব্যক্তি ; ভাষায় ব্যক্তিত্বের স্পর্শগ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থূল রূপায়ণ। ভাষাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়। এই কারণে ভাষাভিত্তিক সমালোচকেরা অনির্দেশ্য স্টাইলের আলেয়ার পিছনে ধাওয়া না করে ভাষারীতির বিশ্লেষণের উপরই সমধিক মনোযোগ ন্যস্ত করেছেন। তাতে সাহিত্যের বিচার সহজতরও হচ্ছে, অধিকতর ভ্রান্তিবিমুক্তও হচ্ছে।

বাস্তবিক, ভাষাভিত্তিক সমালোচনা সমালোচনার একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ভাষার দ্বারাই বলে দেওয়া যায় কোন্ লেখকের কী দৃষ্টিভঙ্গী, কতটুকু তাঁর মানসিক প্রস্তুতি, রসানুভূতির কোন্ পর্যায়ে তিনি অবস্থান করছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যাকে 'রস' বলেন সে অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, তাকে অনুধাবনের চেষ্টা প্রায়শঃ মরীচিকা-সন্ধানে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন জাগতিক ও লৌকিক স্তরে নেমে এসে যদি একবার লেখকের ভাষাভঙ্গীর উপর দৃষ্টি বুলানো যায় তা হলে অনেক বেশী সুফল করতলগত হয় বলেই আমাদের ধারণা। কারণ ভাষা তো শুধুই রচনার একটি বাহ্য অবলম্বন মাত্র নয়। লেখকের ভাবনা চিন্তা কল্পনা তাকে আশ্রয় করে যেমন লীলায়িত হয়েছে তেমনি তার সঙ্গেই এক দেহে লীন হয়ে আছে। ভাষাকে বাদ দিয়ে ভাবকে বোঝা যায় না। ও দুটি জিনিসকে এক থেকে আর ঠিক বিশ্লেষ করাও যায় না। লেখক-মনের একটি জল-অচল প্রকোষ্ঠে ভাব রয়েছে আর-একটি জল-অচল প্রকোষ্ঠে ভাষা রয়েছে—এমনতর বিভাজন সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে, সুতরাং, তথাকথিত মালঞ্চ আর পুষ্পলতিকার উপমাটি অগ্রাহ্য।

ফুলের চারা বেড়ার গা বেয়ে লতিয়ে ওঠে, কিন্তু ভাব শুধু ভাষাকে আশ্রয় করে লতিয়ে ওঠে না, ভাষার মধ্যেই ভাব অনুস্যুত হয়ে আছে। লেখকের ভাষাবিচার থেকেই তাঁর ভাবজগতের অন্ধিসন্ধির খবর লওয়া যায়। ভাষাবিশেষজ্ঞ সমালোচকের নিকট লেখকের রুচি পছন্দ মেজাজ শ্রেণীস্বরূপ কল্পনাশক্তি অথবা তদভাব কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। সত্যি-কারের একজন ভাষাশ্রয়ী সমালোচকের নিকট লেখকের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক গঠন খোলা পুঁথির মতই স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। একজন লেখক কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন, কোন্ প্রক্রিয়ায় শব্দের বিন্যাস করেন, তাঁর বাক্য ছোট কি বড়, তাঁর বাগ্‌ভঙ্গীর ভিতর বাহুল্য শব্দের আলঙ্কারিক শব্দের ধ্বনিময় শব্দের বহুলতা কিংবা স্বল্পতা, সহজ ধাঁচে অথবা তির্যক্ বঙ্কিম বাক্যরীতির ঢঙে তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে ভালবাসেন—এ সব বিচার থেকে বলে দেওয়া যায় লেখক কোন্ প্রবণতাযুক্ত মানুষ : তিনি বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী অথবা মূলতঃ প্রেরণা ও দৈবাবেশের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ; তিনি বৈদগ্ধ্যের চর্চা করেন অথবা কবিজনপ্রসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তি তথা অশিক্ষিতপটুত্বই তাঁর প্রধান অবলম্বন ; তিনি মানবীয় সহানুভূতিতে ঋদ্ধ অথবা দুরারোগ্যভাবে মানববিদ্বেষী তিনি ; তাঁর প্রকৃতি শান্ত স্থির নিরীহ অথবা উদ্দাম প্রবল তাঁর প্রবৃত্তি, তিনি বৈষ্ণবীয় জীবপ্রেমের অনুরাগী অথবা হিংসাশ্রয়ী তাঁর মন ; তিনি প্রবলরূপে সমাজসচেতন অথবা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের আদর্শে আস্থাশীল ; তিনি নাগরিকতার পক্ষপাতী অথবা পল্লী-সংস্কৃতির স্তন্যরসে তাঁর মন আবাল্য পুষ্ট হয়েছে ; তিনি পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গীর ধারাশ্রয়ী লেখক অথবা প্রাচ্য জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর তিনি আত্মপ্রত্যয়নের বুদ্ধিতে অবিচলপদে দণ্ডায়মান ; তিনি পারিবারিক অথবা সামাজিক। এইরূপ আরও শ্রেণীভাগ করা যায়। সেটি সমালোচকের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে সমালোচকের

স্বকীয় প্রবণতা বিচারের মানদণ্ড নির্ণয়ে অনেকখানি কার্যকর হয়ে থাকে। কোন্ সমালোচক কোন্ লেখককে কী মানদণ্ডে বিচার করেন সেটি মূলতঃ সমালোচকের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

ভাষার ভিত্তিতে সাহিত্যবিচারে অগ্রসর হলে গত এক শো সোয়া শো বছরের বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ তথ্য লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে প্রথম মূল্যবান তথ্য হল, ইংরেজ-আগমন-পরবর্তী বাংলা ভাষার আদি অধ্যায়ে কি গদ্যে কি পদ্যে যুক্তিনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ, যাথাযথ্যপ্রীতি (precision) ইত্যাদি লক্ষণ প্রবল ছিল। অর্থাৎ মননধর্মিতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা প্রাথমিক পর্যায়ের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের গদ্যরচনায় এবং মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীন সেনের কাব্যসৃষ্টিতে শৃঙ্খলাবোধ তথা পরিচ্ছন্নতার প্রাখর্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পাই এক সমন্বয়। এই যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টার রচনাবলীর মধ্যে মনীষা ও হৃদয়াবেগের এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছিল। বাংলাদেশ নব্যন্যায়চর্চার দেশ। আবার এই অঞ্চলেই সংস্কৃত কাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের আবেশ বহন করে দেশবাসীর চিত্ততলদেশ থেকে গভীর হৃদয়াবেগের স্রোত উদ্ঘারিত হয়েছিল। শেষোক্ত প্রভাবের সঙ্গে এসে মিশেছিল তৃতীয় একটি ধারা—ইংরেজী রোমাণ্টিক কাব্যের সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে নব্য-ন্যায়ের ঋজুতা দার্ঢ্য মননের খরদ্যুতি এবং কবিজনোচিত নিবিড় সৌন্দর্যপ্রাণতা জড়িয়ে-মিশিয়ে আছে। লেখকের সৌন্দর্যানুভূতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মধ্যে; প্রখর মনস্বিতা ও যুক্তিচেতনা সুমুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে'র মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অনুসরণ করলেই বোঝা

যায়, এই লেখক সর্বপ্রকার ভাবালুতাকে পাশ কাটিয়ে বাঙালী মনে যুক্তিচিন্তার ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অসার পাশ্চাত্ত্যের মোহকে যেমন তিনি কঠিন ভাষায় ধিক্কৃত করেছেন তেমনই অন্ধ পুরাতনপ্রীতিকেও তিরস্কার করতে পশ্চাৎপদ হন নি। মননশীলতা ও যুক্তিবোধের সুকঠিন পাষাণচত্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বাঙালী জাতিকে যে জ্ঞানযোগের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন সেই শিক্ষা পরবর্তী কালের বাঙালী আমরা গ্রহণ করি নি। বাঙালী জাতির উপর বঙ্কিম-চন্দ্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ কথার প্রমাণ, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রকার অপৌরুষেয়তা আর অলৌকিকতা আর অতিপ্রাকৃত-বাদকে ছেদন করে হিন্দুধর্মকে যুক্তির (Rationalism) ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, উত্তরপুরুষের হিন্দুরা তাঁর সে আদর্শ গ্রহণ করে নি। তাঁর মননশীলতাকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে আমরা আজকের দিনের বাঙালীরা বড্ড বেশী নমনীয়তা ও কমনীয়তার পথ বেয়ে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এসে ইতোমধ্যে আমাদের চিন্তার মোড় একেবারেই ঘুরিয়ে দিয়ে গেছেন। আত্যন্তিক গীতলতার চর্চা আর হৃদয়াবেগের অনুশীলন বাঙালী জাতিকে স্বীয় কক্ষচ্যুত করে ভিন্ন কক্ষাশ্রয়ী করে তুলেছে বললেও বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না।

এসব কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য আমাদের অন্য কোন প্রমাণের দ্বারস্থ হবার আবশ্যকতা নেই, সংশ্লিষ্ট লেখকদের এবং বিগত যুগ ও এ যুগের লেখকদের ভাষাভঙ্গী বিশ্লেষণ করলেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব। কাব্যে মধুসূদন বাঙালী মানসে ওজঃগুণ ও দার্ঢ্যের সংস্কার দৃঢ়প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন। সে প্রভাব যেমন পরবর্তী বাংলা কাব্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের র‍্যাশনাল আদর্শের শিক্ষাও বাঙালী মনে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দু হাতে উজাড় করে আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু

তাঁর হাতের ফাঁক গলে কিছু-কিছু ভাল জিনিস স্খলিত হয়ে ঝরে পড়ে গেছে, যা আমাদের ধরে রাখা উচিত ছিল। আমরা সাহিত্যে গত পঞ্চাশ বছরে লালিত্য ও কমনীয়তার যত চর্চা করেছি, ঋজুতার ও দৃঢ়তার চর্চা তার সিকির সিকিও করি নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাভঙ্গী পূর্বাপর অনুসরণ করলে এই সিদ্ধান্তই অপ্রতিরোধ্যভাবে আমাদের মনে জাগে যে, বস্তুজগতের সত্য আবিষ্কারে তাঁর চিত্তের স্ফূর্তি ছিল না। বিশুদ্ধ ভাবলোকে বিহার করে তিনি যে আনন্দ পেতেন, বস্তুসত্যের জগতে পদে পদে সে আনন্দ ক্লিষ্ট হত। তাঁর ভাষার ডৌল বারংবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে নির্বিশেষের ও বিমূর্তের সাধনায় তিনি তদ্‌গতপ্রাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবের সংস্পর্শে তাঁর সেই তন্ময়তার ধ্যান বারেবারেই ভেঙে গেছে। বাস্তবকে তিনি কার্যতঃ এড়াতেই চেয়েছেন। অবশ্য, উচ্চ পর্যায়ের কবিত্বের সাধনায় এই বিমূর্ততা (abstraction) ও নির্বিশেষত্ব (formlessness) অপরিহার্য ; কিন্তু ওই আদর্শের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ায় ধরা-ছোঁয়ার পৃথিবী যেন বহুল পরিমাণে অ-ধরাই থেকে গেছে। পরবর্তী বাংলা কাব্যে এই বিমূর্ততারই জয়জয়কার দেখতে পাই। একদিকে বীর্যহীন আত্মরতি, অন্যদিকে অবাস্তব গগনবিহার। অধিকাংশ কবির মনই আত্মমুখী ; কেউ বহির্মুখী নন। আধুনিক কবিরা আশপাশের মানুষকে ভাল করে যেন চেয়েও দেখেন না। এখনকার কবিতায় বর্ণনাত্মক ও কাহিনী-কাব্যের অসদ্ভাবের মূল কারণ বোধ হয় এইখানেই নিহিত। যে লেখক নিজের মনের ভিতর তলিয়ে আছেন অথবা আকাশে যাঁর দৃষ্টি লীন হয়ে আছে, পারিপার্শ্বিকের চেতনা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। বিমূর্ততার ও আত্মরতির সাধনায় কবিকুলকে দীক্ষিত করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার বন্যা-কপাটকেই যে শুধু উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন তা-ই নয়, জাতির সাংগ্রামিক বৃত্তিকেও যেন কতকটা

পঙ্গু করে রেখে গেছেন। তাঁর বাস্তব-ঔদাসীন্য পরবর্তীকালীন কবিদের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে। বাস্তবস্পর্শশূন্য মনোজীবিতাই যেন এখনকার কাব্যের ধর্ম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তবু কাহিনী-কাব্য লিখেছেন, 'গান্ধারীর আবেদন' লিখেছেন 'বিদায়-অভিশাপ' লিখেছেন, উত্তর-জীবনে সাধারণ মেয়ে আর হরিপদ কেরানীর ট্রাজিডি লিখেছেন, পরবর্তী কালের কবিরা সে পথে কতটা পথ-পরিক্রমা করেছেন? বিদিশা ও ট্রয়ের স্বপ্ন তাঁদের মন থেকে নিকট-বর্তমান ও আশুদৃষ্টিগ্রাহ্যের চেতনা মুছে ফেলেছে বললেও চলে। Concrete-এর প্রতি ঔদাসীন্য ও অনীহা সমসাময়িক কবিকুলের একটি মজ্জাগত ব্যাধিবিশেষ।

অন্যপক্ষে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যে প্রবল ভাবালুতার স্রোত উন্মুক্ত করে বাঙালী পাঠককে তদ্দ্বারা প্লাবিত করে দিয়েছেন বললে অন্যায় হয় না। তিনি চমৎকার কাহিনীকার, দক্ষ চরিত্রস্রষ্টা, কিন্তু যথার্থ মননশীলতার উপাদান তাঁর রচনায় কম। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ ও মহৎ কল্পনাকে তার উপযুক্ত পরিবেশ থেকে ছিন্ন করে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে এনে স্থাপন করেছেন, ফলে সেই কল্পনার মহিমা বহু-তরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বর্ণিত প্রেম ক্ষুদ্র সুখদুঃখের দ্বারা সংকুচিত নিতান্তই গার্হস্থ্য প্রেম। এই প্রেমের মধ্যে না আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির শান্ত মহিমা, না আছে স্থূল দৈহিক জীবনের অলঙ্ঘনীয় রক্ত-মাংসের দাবি। এ শুধুই ভাবাবেগসর্বস্ব প্রেম নিয়ে খেলা-খেলা ব্যসন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ চিন্তা করে না, অনুভব করে মাত্র। যেখানে তাঁর কোন চরিত্র চিন্তায় লিপ্ত হয়েছে, সে চিন্তাও গভীর কোন দার্শনিকতার অনুভূতির দ্বারা বা জীবনরহস্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নি, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে এক ফাঁপা বিদ্রোহের নঙর্থক ভাবাকুলতায় তা পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। অভয়া, কিরণময়ী কিংবা কমলের বিদ্রোহকে

এই দৃষ্টিতে দেখলে তবেই বোধ হয় তাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখা হয়।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে, শরৎচন্দ্র নির্বিশেষের বা বিমূর্তের সাধক ছিলেন না; তিনি একান্তভাবে তাঁর কাছের মানুষ আর অব্যবহিত নিকটবর্তী পরিবেশকে অবলম্বন করেই শিল্প রচনা করেছেন। এটি তাঁর প্রশংসনীয় বাস্তবমুখীনতার পরিচায়ক। তবে বিশেষ ও বাস্তবের প্রতি তাঁর এই আসক্তি আরও অনেক ফলবতী হতে পারত, যদি তিনি কবিদৃষ্টির অধিকারী হতেন। কিন্তু এই দিক দিয়ে তঁার বিশেষ ঘাটতি ছিল বলে মনে হয়। তাঁর সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে বোধ হয় 'শ্রীকান্তে'র শ্মশান-বর্ণনা-জাতীয় দুই-একটি বিচ্ছিন্ন অনুচ্ছেদ ছাড়া আর কোথাও কাব্যানুভূতির অভিব্যক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা বিমূর্তের অনুরাগী নই বটে, তা বলে বাস্তবকে একেবারে কাব্য-ভাববিবর্জিতও দেখতে চাই না। বাস্তবের নিকট-পরিবেশ আর গৃহবদ্ধ লৌকিক প্রেমের মধ্যেই প্রভূত ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করা যায় যদি কাব্যশক্তি লেখকের অধিগত থাকে। বাস্তবানুভূতির সঙ্গে কাব্যানুভূতির সংযোগে কী চমৎকার শিল্পকর্মের স্থষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এ বইয়ের তুলনা নেই।

তাই বলে আধুনিককালীন লেখকদেরই সব দোষ, মধুসূদন-বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্যে কোনরূপ অপূর্ণতা ছিল না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। সত্য কখনও পক্ষপাতী পথ বেয়ে চলে না, দুই প্রান্তীয় বিপরীত উপলব্ধির মধ্যসীমায় তার বিচরণ। মধুসূদনের ভাষার ডৌল, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি অকাট্য ভাবে একটি প্রতিপাদ্যের প্রতি অঙ্গুলিক্ষেপ করছে। সে প্রতিপাদ্য হল এই, এঁরা দুজনেই আভিজাত্য-বাদী বনেদিয়ানায় বিশ্বাসী অহংকৃত প্রকৃতির লেখক ছিলেন। জন-সাধারণের প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্যের মনোভাব দ্বারা এঁদের সমদর্শন খণ্ডিত

হয়েছিল। যা জাঁকালো নয়, ঐশ্বর্য-আড়ম্বরপুর্ণ নয়, কৌলীন্যের তবক-মোড়ানো নয়,-তার প্রতি তুজনার কারুরই আকর্ষণ ছিল না। জনতার জীবনযাপনপ্রণালীর প্রতি মধুসূদনের প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। "Ram and his rabble," প্রমীলার "আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে?" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে মধুসূদনের এই দাম্ভিক মনোভাবের পরিচয় স্থায়ী হয়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন প্রবহমান লিবারেল-বুর্জোয়া আদর্শের একজন এদেশীয় প্রধান ধারক ও বাহকরূপে গণতন্ত্রের জয়গান করলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ সীমার বাইরে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিস্তার খুব সম্ভব মনে-প্রাণে তিনি কামনা করেন নি। তা যদি করতেন, 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার তা হলে বন্ধ করে দিতেন না। সমাজের সর্বস্তরে ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্চকুলের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির পক্ষে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে কাম্য ছিল না, যদিও কৃষক পরাণ মণ্ডলের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই বঙ্কিমচন্দ্রই অতিশয় সার্থকভাবে ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বঙ্গ-দেশের কৃষক' রচনার মধ্যে। জাতীয়তা মন্ত্রের ঋত্বিক্, নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণী-পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রখর মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় এসে তাঁর যুক্তিবাদের প্রক্রিয়ায় দাঁড়ি টানতে বাধ্য হয়েছেন। Rationalismকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে টেনে নেবার চেষ্টা করলে সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না।

তা ছাড়া, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী-ভেদ মানতেন। এই অধিকারী-ভেদের ধারণা ব্রাহ্মণত্ব ও কুলীনত্বের সংস্কার থেকে পাওয়া। এর কোনই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যুক্তির সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরলে এই অধিকারী-ভেদের বেলুন এক লহমায় চুপসে দেওয়া যায়। উপরন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র নাগরিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন। সুমার্জিত বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডল ছাড়া অন্য কোন পরিমণ্ডলে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারতেন না।

আমরা আজ যাকে লোকসংস্কৃতি বলি এবং যা নিয়ে নগরজীবনে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে হৈ-হৈ শুরু করে দিয়েছি, সেই লোকসংস্কৃতির করণ-কারণ পদ্ধতি-প্রকরণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না। গ্রামীণতা তাঁর নিকট জল-অচল ছিল। এই মনোভাবের ভাল দিক আছে মন্দ দিকও আছে। মন্দ দিক এই যে, দেশবাসী অগণিত জন-সাধারণকে তাদের দোষগুণসহ গ্রহণে এই মনোভাব বাধার সৃষ্টি করে, বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় করেও ছিল। তিনি সাধারণ মানুষকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাঁর মানসিক আভিজাত্য তথা প্রবল বৈদগ্ধ্য-চেতনা তাঁর ও জনসাধারণের ভিতর একটা ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল। নগর-জীবনের সংকুচিত ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, তিনি যে ভাষা ও ভঙ্গিমায় শহরের বাবু-কালচ্যরকে ভর্ৎসনা করেছেন তার মধ্যে নেতৃজনোচিত গভীর আত্মপ্রত্যয়ের স্বর ধ্বনিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ভাষার violenceও কম প্রকাশ পায় নি। কই, রবীন্দ্রনাথও তো জনশিক্ষক ছিলেন, তাঁর ভাষায় তো কখনও মনোভাবের এই উদ্দামতা প্রকাশ পায় নি? আমার মনে হয়, তিরস্করণীর এই প্রবলতার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক হয়েছেন দুজন—স্বামী বিবেকানন্দ ও মোহিতলাল মজুমদার। বোধ হয় শক্তির আদর্শ হতেই এই প্রবলতার উদ্ভব। তবে ধীরস্থির শান্ত-সংহত ভাষায় যে এর চেয়ে বেশী কাজ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রমথ চৌধুরী একবার 'সবুজ পত্র' মাসিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'সীতারামের' ভাষার তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের আড়ম্বরবহুলতা ও শব্দৈশ্বর্যপ্রীতি কমে গিয়ে সহজতার বিকাশ হয়েছিল। বোধ হয় প্রতি সার্থক লেখকেরই ব্যক্তিত্বের উন্মেষের এইটেই অপরিহার্য পরিণতি। সফল লেখকমাত্রই ধীরে ধীরে কঠিন থেকে সহজে উত্তীর্ণ হন। এটা যেমন প্রতি লেখকের বেলায়

আলাদা আলাদা করে সত্য, তেমনই আবার সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তুলনায় এ যুগের সাহিত্যের ভাষা কত সরল হয়ে এসেছে। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি অগ্রগতি। কিন্তু সহজতা বা সারল্যই তো সাহিত্যে একমাত্র অনুশীলনের বিষয় নয়। অতিরিক্ত লালিত্য ও কোমলতার মূল্যে যে সারল্য ক্রীত, সেই সারল্য দিয়ে কী হবে? সমৃদ্ধ ও জটিল চিন্তা-কল্পনার সরল-সহজ প্রকাশে কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সহজ চিন্তার সহজ প্রকাশে বিশেষ কোনই কৃতিত্ব নেই। যে-কোন লিখন-ব্যবসায়ী স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে এ কথার প্রমাণ দিতে পারবেন। সুতরাং, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা পুর্বের তুলনায় আড়ম্বরহীন, জটিলতামুক্ত ও সহজ হয়েছে এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করা যায় না। দেখতে হবে আমাদের চিন্তা-কল্পনা সমৃদ্ধ হয়েছে কি না। আটপৌরে ভাব আর মামুলী চিন্তাকে চেষ্টা করলেও জটিল ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায় না; তার ভাষা সাদাসিধে হতে বাধ্য। সুতরাং সারল্য নিজেই একটি গুণ নয়; যখন বস্তুসমৃদ্ধির সঙ্গে সারল্য আর সহজতার সংযোগ হয়, তখনই কেবলমাত্র সারল্য আমাদের কাম্য।

।। সমালোচকের ভূমিকা ।।

সমালোচনা-সাহিত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য অতি দুরূহ। সমালোচনা যে ধরনেরই হোক না কেন, তার জন্য যে দুটি গুণ সবচেয়ে বেশী দরকার তা হল সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীক মনোবৃত্তি। যদি বলেন সাহিত্য-সমালোচনায় রসগ্রহণের ক্ষমতাটাই হল আসল, তার উত্তরে বলি—রসবোধ একটি বিচ্ছিন্ন গুণ নয়, ওটি সত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রকৃত পক্ষে রসবুদ্ধির এমন একটি স্তর আছে যেখানে সত্য এবং সৌন্দর্য অভিন্ন হয়ে যায়। মূলে চাই সত্যানুরাগ। এই সত্যানুরাগ সাহিত্য-উপভোগের বেলায় যেমন প্রয়োজন, তেমনি মত-প্রকাশের বেলায়ও প্রয়োজন। খতিয়ে দেখলে, মত-প্রকাশের বেলায়ই অধিক প্রয়োজন। দলীয় স্বার্থের খাতিরে, গোষ্ঠীর প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কিংবা বন্ধুজনের মুখ চেয়ে সত্য উপলব্ধিকে চেপে রেখে আপাত-প্রীতিকর কথা বললে, তা আর যাই হোক, সমালোচনা হয় না। এ-জাতীয় পিঠ-চাপড়ানো, মন-রাখা, চক্ষুলজ্জার সমালোচনায় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য ভারাক্রান্ত। একে বন্ধুকৃত্য বলা যায়, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা এ থেকে অনেক দূরে।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচককে নির্ভীক হতে হয়। ভয়শূন্যতা সমালোচনা-বৃত্তির একটি গোড়ার কথা। সত্য উপলব্ধির প্রকাশে অথবা সমালোচনার স্পষ্টভাষিতায় কে কী মনে করবে বা কী আচরণ করবে—এই নিয়ে যদি সমালোচককে অষ্টপ্রহর বিব্রত থাকতে হয় তা হলে তাঁর আর যে বৃত্তিই সাজুক, সমালোচকের বৃত্তি সাজে না। সমালোচকের বৃত্তি একটি বৃহৎ অনুশীলনের ব্যাপার। চট করে কেউ সমালোচকের ভূমিকায় সমাসীন হতে পারেন না। এজন্য তাঁকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত

হতে হয়, স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে তিল তিল করে বিকশিত করে তুলতে হয়। প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন। অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার জ্ঞানের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচককে বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত দ্বিধা ও সঙ্কোচ জয় করবার মত মনোবলও আহরণ করে নিতে হয় সংসার-পথে চলতে চলতে। সত্যনিষ্ঠ সমালোচক একই কালে ব্যক্তিত্ববান সমালোচকও বটেন। সত্যের পথে চলবার সাধনা করলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, আবার ব্যক্তিত্বের অনুশীলন করলে সত্যস্পৃহা বাড়ে। ক্রমাগত এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমালোচক শক্তি সংগ্রহ করতে থাকেন। তারপর এক সময়ে তিনি অপ্রতিরোধ্য হন।

সমালোচনা নানা ধরনের হতে পারে। তবে তার মূল প্রকারভেদ দুটি—শিল্প-সমালোচনা ও সমাজ-সমালোচনা। শিল্প বলতে এখানে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় ইত্যাদি বিবিধ সুকুমার কলাকে বোঝাচ্ছে। আর সমাজ-সমালোচনার অর্থ তার নামেই স্বপ্রকাশ। সমাজের ভাল-মন্দ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন এবং সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারা লক্ষ্য করে সে বিষয়ে মত প্রকাশ করেন, তাঁদের সমাজ-সমালোচক বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী একটি নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এক সময়ে শিল্প-সমালোচনার সঙ্গে সমাজ-সমালোচনার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। দুটির বিচারক্ষেত্র ছিল আলাদা। এখন আর সে কথা বলা যায় না। এখন একটি আর-একটির চৌহদ্দি ফুঁড়ে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই পারস্পরিক অনুপ্রবেশ নিত্য ঘটছে। বিশেষতঃ, শিল্প-সমালোচনায় সমাজভাবনার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনকার কালের বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচকগণ যুগপৎ সমাজ-সমালোচকও বটেন। সাহিত্যবুদ্ধির সঙ্গে সমাজভাবনাকে অন্বিত করে একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নের রেওয়াজ

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজী সাহিত্যে এক যুগ আগে ম্যাথু আর্নল্ডের দ্বারা এই রেওয়াজের ক্ষীণ সূত্রপাত হয়, এখন প্রায় সকল বিশিষ্ট সমালোচকই এই আদর্শটিকে গ্রহণ করেছেন। এ যুগের একাধিক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক সমাজভাবনায় সমাচ্ছন্ন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের সঙ্গে অপরের মিল না হতে পারে, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক সিদ্ধান্তসমূহের পিছনে যে নিগূঢ় সমাজচিন্তা বর্তমান তা তাঁদের লেখা একটু অবধানসহকারে পড়লেই বোঝা যায়। অন্যপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক স্বর্গত কবি মোহিতলাল মজুমদার বর্তমানকালীন বামপন্থী চিন্তাদর্শের মানদণ্ডে যে পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত হোন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, যাকে সাহিত্যিক পরিভাষায় 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য-সমালোচক বলা হয় তা তিনি কখনও ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বলিষ্ঠ চিন্তাদর্শ তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার ছত্রে ছত্রে অনুস্যূত হয়ে আছে। মাইকেল মধুসূদনের কল্পনার বলিষ্ঠতা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ঋজুতা ও সংযম এবং স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের বাণী এই সাহিত্যপ্রাণ কবি-সমালোচকের ভাব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি যুদ্ধোত্তর যুগের প্রবহমান রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ অথবা একালীন অন্যান্য বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি সত্য কথা, কিন্তু সে এজন্য নয় যে তিনি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন—সে এজন্য যে, উনিশ শতকের বাংলার ভাবাদর্শ বিনিঃশেষে তাঁর মনোহরণ করেছিল। সে এমনি তন্ময়তা যে, এর পর আর তাঁর মনে অন্য কোন বিশ্বাসের জায়গা ছিল না। এখনকার কালের রুচির সঙ্গে তাঁর মেজাজের মিল ছিল না বলে তাঁকে সংরক্ষণশীল বলুন আর যা-ই বলুন, মোহিতলালের সাহিত্য-সমালোচনাকে সমাজভাবনা-নিরপেক্ষ ভাবে ভাবা যায় না।

সমালোচনায় সত্যনিষ্ঠা ও ভয়হীনতার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, শুধুমাত্র

মতামতের সারবত্তা আর গুরুত্ববিধানের জন্যই নিজেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। এ প্রস্তুতির অঙ্গ হল অধ্যয়ন, চিন্তন-মনন, বিচার। অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে, চিন্তন-মননের দ্বারা জ্ঞানের গভীরতা সম্পাদন করতে হবে, বিচারের দ্বারা গ্রহণ-বর্জন করতে হবে। প্রথমটিতে সংগ্রহ ও ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়টিতে অন্তর্মুখীনতা, তৃতীয়টিতে নির্বাচন। সব কটি প্রক্রিয়া একত্র সম্মিলিত হলে তবেই যথার্থ আদর্শ সমালোচকের ভূমিকা রচিত হয়। সমালোচককে শুধু রসগ্রাহী হলেই চলে না, জ্ঞানীও হতে হয়। যে রসবিচারের পশ্চাতে জ্ঞানের পটভূমি নেই তার ভিত নড়বড়ে। আবার জ্ঞানভূয়িষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর রস-বুদ্ধির কমতি ঘটলে তার দ্বারাও ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। রসবুদ্ধি-বর্জিত নিরবচ্ছিন্ন মননমূলক সমালোচনা রসিকের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে না।

আজকাল সাহিত্য ও সমাজভাবনার মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার যে চেষ্টা চলছে তা আদর্শ সমালোচকের পক্ষে বিশেষ কাম্য অবস্থা। রস ও বুদ্ধির দ্বৈতরাজ্য এভাবে একীকৃত হবার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে আছে রস, সমাজভাবনায় আছে মননশীলতা। প্রথমটি সংশ্লেষণাত্মক, দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণাত্মক। এ দুয়ের সংযোগে রস ও বুদ্ধির হরিহরমিলন সংসাধিত হয়ে সমালোচকের দায়িত্ব ও গুরুত্বকে পূর্বের তুলনায় বহুগুণে সম্প্রসারিত করেছে। আধুনিক কালের শক্তিমান সমালোচক একটি ব্যক্তিত্বের আধারে রসিক, বিচারক ও সমাজনেতার ভূমিকাকে সংযুক্ত করেছেন।

তা হলেই দেখা যায়, কাজটি কত দুরূহ। শুধুমাত্র সাহিত্যের উপর দখল পাকা করতেই গোটা জীবন কেটে যাবার দাখিল, তার উপর আছে সমাজ-সচেতনতার গুরু দায়িত্ব। গড়পরতা সাহিত্যকর্মীর দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যায়, সাহিত্যভাবনা ও সমাজভাবনার মধ্যে একটা আপাত-বৈষম্য

আছে। রসচর্চার আত্মপ্রসাদে যাঁরা নেশাগ্রস্তের ন্যায় সৃষ্টি-কর্মে বুঁদ হয়ে আছেন তাঁরা সমাজের বিষয়ে পারতপক্ষে চিন্তা করতে চান না। তাঁদের তাবৎ কল্পনা ও চিন্তা সৌন্দর্য ও আনন্দ-সৃষ্টির আবেগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই আদর্শ মনোহর এবং মান্য হলেও এর ভিতর এক ধরনের একদেশদর্শিতা আছে। সমালোচককে আয়াসের দ্বারা এই একদেশদর্শিতার সংস্কার অতিক্রম করতে হয়। তাঁকে সৌন্দর্য এবং জ্ঞান দুয়েরই অনুশীলন করতে হয়। সমালোচকের মানসিক গঠনের প্রধান ত্রুটি এই যে, তিনি আশানুরূপ মৌলিক কল্পনাশক্তির অধিকারী নন কিংবা সৃষ্টিধর্মী নন। সৃষ্টিপ্রয়াসের দিক থেকে কবি, নাট্যকার বা কাহিনীকারের তুলনায় সমালোচকের স্থান নীচে। সমালোচকের কাজ মূলতঃ মৌলিক সৃষ্টির কাজ নয়, সৃষ্ট শিল্পকর্মের মূল্য উপলব্ধি (appreciation) ও মূল্য পরিমাপনের (valuation) কাজ। স্বতঃই এ জিনিস সৃষ্টির তুলনায় গৌণ ব্যাপার। কিন্তু এক দিক দিয়ে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকের উপরে সমালোচকের জিত। আমি এখানে হেঁজি-পেঁজি সমালোচকের কথা বলছি না, প্রকৃত সমালোচকের কথা বলছি। সংবাদ-পত্রের পুস্তকপরিচয়-লিখিয়ে বশম্বদ সমালোচকদের কথা বলছি না, সত্যনিষ্ঠ সমালোচকের কথা বলছি। সৃষ্টিধর্মী লেখকের তুলনায় সমালোচকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর। অন্ততঃ, জ্ঞান ব্যাপক এবং বহুমুখী না হলে সমালোচকের পক্ষে সৃষ্টিকর্মের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। সমালোচকের কাজ যেহেতু মূলতঃ উপলব্ধি ও মূল্যায়নের কাজ, সেইহেতুই বিশেষ করে তাঁকে তাঁর আগ্রহ ও জিজ্ঞাসাকে বিচিত্র পথে সম্প্রসারিত করতে হয়। সর্বগ্রাসী সওদাগরের ন্যায় তাঁকে ঘাটে ঘাটে তাঁর কৌতূহলের নৌকা ভিড়াতে হয় এবং নানাবিধ সামগ্রীর দ্বারা নৌকা বোঝাই করতে হয়। ঘড়ির দোলকের মত তিনি প্রতিনিয়ত রস ও জ্ঞানের বিপরীত দ্বৈত রাজ্যে সঞ্চরণ করেন। কখনও রস তাঁকে টানে,

কখনও জ্ঞান তাঁর অভিনিবেশ আকর্ষণ করে। সমালোচকের এই বিচিত্রপথগামিতার সংবাদ মৌলিক লেখকেরা সচরাচর রাখেন না, তাই তাঁরা তাঁকে প্রায়শঃ ভুল বোঝেন। এ-জাতীয় ভুল-বোঝাবুঝি থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্কেও কোন কোন সময় চিড় ধরতে দেখা যায়।

বন্ধুত্বের সমস্যা কঠিন সমস্যা। সত্যানুরাগী সমালোচককে নিয়ত এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বন্ধুর শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে বন্ধু মুখভার করবেন, অথচ সত্য কথা বলতে হলে এ-জাতীয় বিরূপ মন্তব্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সমালোচকের সহচর। একদিকে বন্ধুকৃত্যের ও সামাজিকতার দাবি, অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠার দাবি—এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ সত্যসন্ধানী সমালোচকের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। তবে এই উন্নয়ন একদিনে ঘটে না, বহু দ্বিধাদ্বন্দ্ব-দোদুল্যমানতার স্তর বেয়ে তবে এই অবস্থায় উপনীত হতে পারা যায়। সমালোচকের মধ্যে যে সামাজিক মানুষটি আছে সে তাঁর কানে মন্ত্র দেয় লেখকের মনে ব্যথা দেওয়াটা ঠিক নয়, প্রকৃত সত্য গোপন করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু করে উৎসাহ দিলে প্রীতি ও মৈত্রীর পরিমণ্ডলের ভিতর সকলেরই মানসিক শান্তি অব্যাহত থাকে এবং তাতে বন্ধুত্বের এলাকা বর্ধিত হয়। মানবীয় বিবেচনাবোধ বলে, কারও সম্পর্কেই অপ্রিয়ভাষী হওয়া উচিত নয়। অপ্রিয় বাক্য সত্য হলে তা বলতে নেই, এই হল আমাদের প্রাচীনদের নির্দেশ। অন্যপক্ষে, সমালোচকের ভিতর যে সত্যসন্ধানী সত্তাটি আছে তা তাঁর এই সামাজিকতার স্পৃহাকে বিদ্রূপ করে। সত্য বন্ধুত্ব অপেক্ষা বড়, সমাজ অপেক্ষা বড়, দেশ অপেক্ষা বড় —সত্য নিরপেক্ষ। তার তৌলদণ্ড স্থির। এই নিরপেক্ষতার বিচারে যদি কোন শিল্পকর্মের গলদ বেরিয়ে পড়ে তবে সে কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতেই হবে, এমন কি শতকরা নিরনব্বুইটি মানুষের রায় যদি এর

প্রতিকূল হয় তা হলেও এই অকম্প সত্যভাষণের বলিষ্ঠতা থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। সত্যের পথ দুর্গম ও ক্ষুরধার। সে পথে সকলে চলতে পারে না। যাঁর উপযুক্ত মনোবল আছে, একাকিত্বের ঝুঁকি নেবার মত মানসিক প্রস্তুতি আছে, ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারে যাঁর সহিষ্ণুতার অবধি নেই, তিনিই শুধু সত্যের সঙ্কীর্ণ বর্ত্মে চলবার অধিকার লাভ করেন। যাঁরা আরামপ্রয়াসী, প্রতি পদে বন্ধুত্বের মুখাপেক্ষী, জনপ্রিয়তার হাওয়ার গতি অনুযায়ী যাঁদের চলা ও বলা নিয়ন্ত্রিত হয়, ক্ষমতাবানের অভিপ্রায়ের নিকট যাঁরা তাঁদের বিবেকবুদ্ধি সমর্পণ করতে দ্বিধা করেন না, তাঁরা সত্যানুসন্ধানের এলাকা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এ-জাতীয় সমালোচকের দ্বারা বড়জোর দলীয় স্বার্থ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষিত হয়, সত্যের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। সত্যসন্ধানী সমালোচক ব্যক্তিত্ববান পুরুষ এবং অপরিমিত শক্তির অধীশ্বর হয়েও প্রায়শ একক নিঃসঙ্গ নিভৃতিচারী। তাঁর চরিত্র এবং কর্মের বৈশিষ্ট্যই তাঁকে এই বিরূপ ভাগ্যের পথে টেনে অন ।াে

সমালোচককে একটি কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। তিনি শিল্প-কর্মের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অপ্রিয়ভাষীই হোন আর রূঢ়ভাষীই হোন তাঁর সত্যানুরাগ কোনও সময়েই যেন অসূয়ার (malice) দ্বারা মলিন না হয়। সত্যের উপর এতটুকু অসূয়ার যদি দাগ লাগে, সত্যের মূল্যহানি হয়। যাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে সমালোচক সমালোচনা করেন তাঁদের বুঝতে দিতে হবে যে, সমালোচকের সত্যসন্ধান ছাড়া দ্বিতীয় কোন লক্ষ্য নেই। তাঁর নিকট এই মুহূর্তে বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস যেমন বড় নয় তেমনি বন্ধুত্বের প্রতিকূল মনোভাবটিও গ্রাহ্য নয়। ব্যক্তিজীবনে মানুষ অনেক সময় রিপুবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ঃ যার স্বভাবে আবেগপ্রবণতা বেশী সে ভালবাসার আবেগের দ্বারা যেমন অভিভূত হয় তেমনি অসূয়া-বিদ্বেষের দ্বারাও কম মুহ্যমান হয় না।

সমালোচকের নিকট এসব বিপরীত মনোভাবের কোন মূল্য নেই। তাঁর বুদ্ধি স্থির, অনপেক্ষ। শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াসকে রসোপলব্ধির মাপকাঠিতে এবং তাঁর ভাবাদর্শকে যুক্তিবুদ্ধির নিকষে যাচাই করা ছাড়া এই মুহূর্তে সমালোচকের সমক্ষে অন্য কোন কাজ নেই। এই বিচারক্রিয়ায় সমালোচকের পক্ষে নিজের দৃষ্টিকোণের হিসাব লওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের দৃষ্টিকোণেরও হিসাব নিতে হয়। একটি বক্তব্যের প্রতিকূলে কী কী কথা থাকতে পারে তা অনুমান করে নিতে হয় এবং তাদের খণ্ডন করতে হয়। প্রতিপক্ষকে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ না দিয়ে সে সকল আপত্তি নিজে উত্থাপন করে আগেভাগে তাদের মূলচ্ছেদ করতে হয়। মানুষ মাত্রই কোন-না-কোন prejudice বা bias-এর অধীন। সেইজন্য সমালোচককে সর্বদা এ-জাতীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে হয়। নিজের মনগড়া ধারণা বা বদ্ধমূল সংস্কার যাতে না সত্যের স্থলাভিষিক্ত হয় সে বিষয়ে তাঁর কঠোর অবধানতার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় সমালোচকের অসতর্কতার সুযোগে অবলীলায়িত সিদ্ধান্ত (facile generalization) সুচিন্তিত, স্থির সিদ্ধান্তের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে স্বয়ং সমলোচককেই প্রতারিত করে। সে বিষয়েও সাবধানতার প্রয়োজন আছে। তদুপরি আছে মন্তব্যসর্বস্ব আলোচনা আর প্রকৃত সমালোচনার মধ্যে ভেদজ্ঞানের প্রশ্ন। প্রকৃত সমালোচনায় প্রথমে তথ্য বিবৃত করতে হয়, তারপর মন্তব্য প্রকাশের পালা। সে মন্তব্যও দ্রুতনিষ্পন্ন মন্তব্য নয়, যুক্তিনির্ভর মন্তব্য। প্রতিটি কথার পিছনে যুক্তিবুদ্ধির দ্যোতনা থাকলে তবেই সিদ্ধান্ত সত্যিকার জোরালো হতে পারে।

এ সব বলবার অপেক্ষা রাখে না, তবু বলা হল সমালোচকের দায়িত্বটিকে সুচিহ্নিত করবার জন্য। সমালোচকেরা এ সব নিয়মবিধি জানেন, তবু মাঝে মাঝে আত্মানুসন্ধানের জন্য এগুলি মনে মনে ঝালিয়ে

নেবার প্রয়োজন আছে। সমালোচক সমালোচক বলেই আত্ম-সমালোচকও বটেন। পরের সমালোচনাতেই তাঁর সমালোচনাস্পৃহা ক্ষান্ত হয় না, নিজেকে তিনি অনুক্ষণ সমালোচনা-শল্যের দ্বারা বিদ্ধ করেন। সমালোচকের সত্যসন্ধানের অভ্যাসটিই তাঁকে নিজের উপর বিশ্লেষণী দৃষ্টি আরোপের এবং নির্মম হবার প্রেরণা জোগায়। সত্য-প্রয়াসী সমালোচক স্বীয় ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যত সচেতন, অপরে তার সিকির সিকিও নয়। তাঁর স্বভাবে অসূয়া আছে কি না তিনি আত্ম-সন্ধানের দ্বারা তা অবগত হন, এবং অসূয়া থাকলে সংযমের দ্বারা, শুভবুদ্ধির অনুশীলনের দ্বারা তাকে অতিক্রম করবার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। অসূয়া তথা শ্রদ্ধাবোধের অভাব সমালোচকের সবচাইতে বড় শত্রু। কঠিন সাধনার দ্বারা এই বিচ্যুতি জয় করতে হয়।

এইখানেই জীবনচর্যার প্রশ্ন আসে। সমালোচককে শুধু শিল্প-সাহিত্যের জগতে বাস করলেই হয় না, তাঁকে জীবনসাধনার স্তরেও বিচরণ করতে হয়। শিল্প আর জীবন এক আধারে সমন্বিত হলে তবেই সমালোচকের সমালোচনায় প্রকৃত জোর আসে। শিল্প ও জীবন-সাধনার অখণ্ড ভূমিতে যে সমালোচকের বিচরণ, নিছক শিল্পসাহিত্যভুক্ সমালোচক কখনও তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না। আত্মপরীক্ষা আর আত্মগ্লানির অনেক ঝড়ঝাপ্টা সয়ে, সতত আত্মোন্নতি-প্রয়াসের অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে এই বাঞ্ছিত অবস্থার তীরে এসে পৌছানো যায়।

এত করেও সমালোচক কারও মন পান না। সৃষ্টিধর্মী লেখকেরা তাঁর উপর স্বভাবতঃই বীতরাগ থাকেন। খুব সম্ভব শ্রেণীস্বার্থবুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞাতসারে চালিত হয়েই তাঁরা যূথবদ্ধভাবে সমালোচককে দলিত করবার চেষ্টা করেন। সমালোচকের অসূয়াহীনতার নিঃসংশয় প্রমাণ পেলেও শুধুমাত্র তাঁর সত্যভাষণের অভ্যাসের জন্যই তাঁর উপর তাঁরা

জাতক্রোধ হন। সত্যভাষী সমালোচক শুধু তো অপ্রশংসাই করেন না, প্রশংসাও করেন—কখনও কখনও উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন। বস্তুতঃ, কোন লেখকের অনুকূলে দুটি ভাল কথা বলবার সুযোগ পেলে সমালোচকের চেয়ে সুখী আর কেউ হন না। তাঁর অন্তরের প্রসন্নতা ও শুভেচ্ছা ভালরই শুধু সন্ধান করে; আক্ষেপ এই যে, ভাল সব সময় হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না। কোন-একটি বিশেষ শিল্পকর্মের অপ্রশংসা আর শিল্পীর অপ্রশংসা এক কথা নয়। আজ বিরূপ সমালোচনার প্রয়োজন হয়েছে বলে সে প্রয়োজন সব সময় থাকবে এমন কোন কথা নেই। এ-জাতীয় যুক্তি সমালোচকের নিকট প্রশ্রয় পায় না। তিনি সর্বদা খোলা মন নিয়ে সমালোচনায় অগ্রসর হন। প্রতিকূল সমালোচনায় তাঁর লেখনী ক্লিষ্ট হয়, অনুকূল সমালোচনায় তা স্ফূর্তিযুক্ত হয়। সমালোচকের পরিতাপ এই যে, তাঁর জীবনে এই স্ফূর্তির উপলক্ষ খুব ঘন ঘন সৃষ্টি হয় না। তাঁর অমোঘ সত্যবিচারের মনোবৃত্তি তাঁকে এই প্রসন্নতার প্রসাদ থেকে প্রায়শঃ বঞ্চিত করে। এ কথা সংশ্লিষ্ট সকলকে বুঝতে হবে যে, বিরূপ সমালোচনার বাধ্যবাধকতায় সমালোচক নিজে যত পীড়িত হন এমন আর কেউ নন। তিনি নিকটতম উপলক্ষে এই মানসিক ক্লেশ ক্ষালনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ক্ষোভের বিষয়, সহসা সে সুযোগ তিনি পান না। তিনি যে অসূয়ার অধীন নন সে কথা প্রমাণ করতে সমালোচকের হয়তো এক যুগ কেটে যায়। কখনও-কখনও আদৌ তা প্রমাণ করা হয় না।

কিন্তু সে কথা কে বোঝে! মৌলিক লেখক প্রশংসাটিকে প্রাপ্য বলে মনে করেন, অপ্রশংসাটিকে অন্যায়জ্ঞানে সমালোচকের উপর রুষ্ট হন। মৌলিক লেখকের এই রোষ শুধু অন্তরেই নিবদ্ধ থাকে না, মাঝে মাঝে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটে। তাঁর আচরণে সেটা প্রকাশ পায়। কখনও কখনও সমালোচককে ওই বাবদে সূক্ষ্ম এবং দৃশ্য দ্বিবিধ অপমানেরই

সম্মুখীন হতে হয়। অপমানচেষ্টা যে সংকল্পিত তা বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না। এতে তিনি সাতিশয় মানসিক কষ্ট অনুভব করেন, বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক সাহিত্য এবং সমাজের যাঁরা সমালোচক, তাঁদের এ-জাতীয় লাঞ্ছনা নিত্য সইতে হয়। আজকাল আবার এক নতুন গেরো দেখা দিয়েছে। মৌলিক লেখকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিকট আত্মীয়-আত্মীয়ারাও মুখ ভার করে বসে থাকেন। আত্মীয়াদের মধ্যেই এই বিমর্ষতা অধিক দেখা যায়। এক সময় ছিল যখন দেশে নারীজাগরণ তেমন হয় নি। সমালোচকের প্রশংসা-অপ্রশংসা শুধু লেখকের উপরই বর্তাত। লেখকের অর্ধাঙ্গিনী ঘর সামলাতেন, লেখক বাহির সামলাতেন। 'এখন আর সে কথা বলা যায় না। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী স্বামীর কর্মজীবনের সুখদুঃখেরও অংশীদার হয়ে উঠতে চাইছেন। এতে সমালোচক বেচারার হয়েছে মুশকিল। তিনি সচকিত হয়ে লক্ষ্য করছেন, তাঁর সামাজিকতার এলাকা মর্মান্তিকভাবে ক্রমসংকুচিত হয়ে পড়ছে। এখন তাঁকে নূতন নূতন এলাকা থেকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লেখকের রোষকে সমালোচক তেমন পরোয়া করেন না, কিন্তু নারীর রোষ যে কী বস্তু ভুক্তভোগী মাত্রই তা হাড়ে হাড়ে জানেন। এই রোষ সমালোচকের ঊর্ধ্ব এবং অধস্তন চৌদ্দ পুরুষকে শাপান্ত না করে তৃপ্ত হয় না, সে কথা একপ্রকার জোর করেই বলা চলে।

শাপ-শাপান্তের কথায় মনে পড়ল, হেন কটূক্তি নেই যা লেখকপক্ষ থেকে সমালোচকের বিরুদ্ধে এযাবৎ প্রযুক্ত না হয়েছে। সমালোচিত ও সমালোচকে যেন অহি-নকুল সম্পর্ক। কয়েক বছর আগে ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন *Statesman* পত্রিকায় "On Reviewing" ও "On Being Reviewed" নামক দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে গ্রন্থকাররা গ্রন্থসমালোচকদের সচরাচর কী-জাতীয় গালমন্দ করেন তার একটা

ফিরিস্তি ছিল। বর্তমান লেখক সমালোচনাজীবী বলে নিতান্ত শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেই সেই ফিরিস্তির সংকলনে বিরত রইলেন।

পেশাদার গ্রন্থসমালোচকদের সম্পর্কেই যখন এই মনোভাব, তখন সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রকৃত সমালোচকের সম্পর্কে কী মনোভাব হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সব আঘাত-প্রত্যাঘাত বাধা-বিপত্তি মেনে নিয়েই সমালোচককে দৃঢ়পদে নিজের পথে চলতে হয়। সমালোচকের বিরুদ্ধে যত কটূক্তিই বর্ষিত হোক না কেন, তিনি তাঁর ভূমিকার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তিলেকের জন্যও সন্দিহান নন। তিনি তাঁর মর্যাদায় পুর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত। তিনি মনে মনে জানেন, তিনি সংসাহিত্যের পোষক, উদীয়মান শক্তিমান সাহিত্যিকের উৎসাহ-দাতা, সাহিত্যের অগ্রগতির সহায়ক, সমসাময়িক সাহিত্যের পথনির্দেশক। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি একজন সংস্কৃতিনেতা, সামাজিক চিন্তানায়ক। জাতীয় সাহিত্যই শুধু তাঁর সেবার সুফল লাভ করে না, সমাজ এবং রাষ্ট্রও তাঁর সেবার দ্বারা উপকৃত হয়।

আধুনিক কাব্য-আন্দোলন

আজকাল ‘কবিতা মেলা’ ‘কবিতা পড়ো’ ‘কবিতা প্রদর্শনী’ ইত্যাদি বিচিত্র নামের আবরণে বাংলা দেশে কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলবার একটা বিধিবদ্ধ চেষ্টা চলছে। এ সবই শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। আমরা বাঙালীরা স্বভাবতঃ কাব্যপ্রিয় জাতি হলেও এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতির মাথার মুকুট বলে সর্বত্র অভিনন্দিত হলেও, গত কিছুকাল ধরে নানা বিরূপ অবস্থার চাপে বাঙালীর কাব্যোপভোগের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছুটা ভাঁটার টান লেগেছিল। মাঝখানে অমুক অমুক দেশনেতা আমাদের শুনিয়েছিলেন, আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মাড়োয়ারী-দের মত হতে না পারলে নাকি আমাদের মুক্তি নেই, কল-কারখানা-ব্যাঙ্ক-ইনসিওর ইত্যাদি না জাগলে নাকি দেশ জাগবে না, সরকারী চাকুরির প্রতিযোগিতায় অবাঙালীদের নাগাল না ধরা পর্যন্ত নাকি আমরা সর্ব-ভারতীয় হরিহর-ছত্রের মেলায় অকুলীন হয়েই থাকব। বাস্তবপন্থী দেশনেতার হিতোপদেশের প্রতি কর্ণপাত করতে গিয়ে সেই যে আমরা অব্যাপারে ব্যাপার করতে শুরু করেছিলাম তাতে এ-কুল ও-কুল দুই কুলই নষ্ট হবার যোগাড় হয়েছিল। আমরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি কাব্য ছেড়ে অবরেণ্যকে বরণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের জাতিগত স্বধর্মকেই প্রায় হারাতে বসেছিলাম। সব জাতিরই একটা বৈষয়িক দিক থাকে, কিন্তু যে জাতি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ তার বৈষয়িকতার তলায় থাকে একটা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তি। ইংরেজের এই ভিত্তি আছে, ফরাসীদের এই ভিত্তি আছে, বাঙালীরও এই ভিত্তি আছে। কিন্তু আত্যন্তিক বাস্তববুদ্ধির প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা

আমাদের সেই সুদৃঢ় ভিত্তিগাত্রের আশ্রয় থেকে প্রায়-বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম। কবিতাকে নির্বাসন দিয়ে আমরা তেজারতির ব্যবসা ধরেছিলাম ; শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আমাদের সহজাত প্রাণের স্ফূর্তি ব্যাঙ্কের লেজারের খাতায় আর শেয়ার-মার্কেটের দর-ওঠানামার পঞ্জীপত্রে পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

ইদানীং আমাদের কিঞ্চিৎ শুভবুদ্ধি হয়েছে। অনেক ঘা খেয়ে ঠেকে শিখে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, যার যাতে সহজ প্রবণতা তার অনুসরণেই তার মুক্তি ; যার যেটা হবার নয় তাকে দিয়ে সেইটে হওয়ানোর চেষ্টা করলে প্রায়শঃ হিতে বিপরীত ফলোদয় হয়। বাঙালী প্রচণ্ড রকমের ব্যবসায়ী হবে বা প্রবল প্রতাপযুক্ত কর্মবীর হবে এ তার কৌলিক কোষ্ঠীতে লেখে নি। সংস্কৃতিই তার প্রাণ, বৈদগ্ধ্যই তার অবলম্বন ; সুতরাং ওই সদ্বৃত্তিসমূহের চর্চাতেই তার প্রকৃত মহিমার বিস্তার।

উপলব্ধিটুকু বিলম্বাগত হলেও এ-জাতীয় বোধোদয় যে আমাদের মধ্যে ঘটছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোধোদয়ের অন্যতর প্রমাণ আমরা আমাদের সহজাত কাব্যপ্রীতির গৌরব সম্পর্কে ইদানীং বেশ-কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছি আর ওই সচেতনতারই অভিব্যক্তি হল 'কবিতা পড়ো', 'কবিতা মেলা' ইত্যাদি আন্দোলন। এইসব আন্দোলনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে জানি, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে অন্ততঃ এই সত্যের প্রকাশ ঘটছে যে, আমরা আমাদের জীবন-পরিকল্পনার মধ্যে কাব্যকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছি। শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নির্যাস হল কাব্য। শিল্প-সাহিত্যের আর সব প্রকাশ-মাধ্যমের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ভেজাল আছে। নাটক স্থূল ঘটনার মলিন স্পর্শে কলুষিত, কথাসাহিত্যে অগুনতি কথার কারবার। খতিয়ে দেখতে গেলে, সবচেয়ে বেশী ভেজাল বোধহয়

কথাসাহিত্যেই। কথাসাহিত্য নামধারী সাহিত্য প্রায়শঃ কথার জঞ্জাল ভিন্ন কিছু নয়। ওই মাধ্যমটি কথামাত্রসার বলেই বোধ হয় ওর নামকরণ করেছি আমরা কথাসাহিত্য। অনেকখানি নীরের সঙ্গে একটুখানি ক্ষীর কারও কারও লেখায় মিশে থাকে, কিন্তু তাকে চেনবার কৌশল জানা চাই। কথাসাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের বোধ ওই কৌশলের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু কাব্য সম্পর্কে তেমন কথা বলা যায় না। কাব্য হল নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ রসের আধার ও আশ্রয়। হৃদয়ের গভীরতম ও পবিত্রতম অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হলে কবিতার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বোধ করি আর কোন উপায় নেই। আর আছে সঙ্গীত। কিন্তু সে তো কাব্যেরই স্বরূপ। এখানে কাব্য বা সঙ্গীতের স্বতঃসিদ্ধ উৎকর্ষের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না; আমার বলবার কথা, আমরা জাতি হিসাবে কবিতার যত বেশী চর্চা করব তত আমাদের মন থেকে মালিন্য ঝরে যাবে, স্থূলতা ঝরে যাবে, আমাদের মনপ্রাণ সুন্দর হয়ে উঠবে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বস্তু সৃষ্টি এবং উপভোগ—উভয়ই মনকে সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা অভিষিক্ত করতে সহায়তা করে। রোমাঞ্চকর ঘটনার ঝাঁঝালো স্বাদবর্জিত কিংবা মুখরোচক প্রেমকাহিনীর সরস মুখরতাবর্জিত বিশুদ্ধ একটি ভাবের ভিত্তির উপর যে কবিতার প্রতিষ্ঠা, সেই রচনা সৃষ্টি যেমন কঠিন কাজ তেমনই তা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারার মধ্যেও একটা বিশেষ গৌরব আছে। একটি লিরিক কবিতার বুনানির মধ্যে লোমহর্ষক ঘটনার উত্তেজনাও থাকে না, আবার আখ্যান-আখ্যায়িকা-কাহিনীরও ভেজাল থাকে না, অথচ সে জিনিস তার সহজ আবেদনের দ্বারা কত অবলীলায় রসিকের মন সিক্ত করে তোলে। কবিতার এই একান্ত-পরিস্রুত শুদ্ধতম ভাবরূপকে ধ্যান ধারণা ও ধারণ করতে পারার মধ্যেই একটা জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পসিদ্ধি নিহিত।

বাঙালী জাতিকে আমরা এইরূপ মহতী সিদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমরা আমাদের বৈষয়িক স্বার্থ অবশ্যই রক্ষা করব, ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্পোদ্যোগে আমাদের আরও বেশী সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়বার পথেও কোন বাধা নেই, রাজনীতিচর্চা চাকুরি-বিষয়াদির অনুশীলন সবই অব্যাহত থাক্; কিন্তু বহির্জগতে যা-ই আমরা করি না কেন, অন্তর্জগতে আমরা আমাদের মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব না এই আমাদের পণ হোক। কাব্য-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আমাদের জীবনের একেবারে কেন্দ্রমধ্যে স্থাপন করা চাই। নিঃশ্বাস গ্রহণ ও মোচনের মতই যেন আমরা আমাদের জীবনে কাব্যোপভোগকে সহজ করে তুলতে পারি এমনই ভাবে আমাদের জীবন পরিকল্পিত হোক। যে-কোন প্রকারের কবিতা-আন্দোলনের মধ্যে সেই পথে অগ্রগমনের একটি সম্ভাবনা নিহিত আছে। সুতরাং এ-জাতীয় প্রয়াস আমাদের প্রত্যাশার অনুরূপ যদি না-ও হয় তবু তাকে অভিনন্দন জানানোর মত খোলা মন আমাদের সকলেরই থাকা উচিত।

প্রত্যাশার প্রশ্নটি তোলবার একটু কারণ আছে। 'কবিতা মেলা' 'আরও কবিতা পড়ো' আখ্যাযুক্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা চটুলতা আছে বলে সন্দেহ হয়। বিদেশের 'Poetry Fair', 'Read More Poetry' কথাগুলিকেই যেন হুবহু অনুবাদ করে এই অন্যথা-বাঞ্ছনীয় কাব্য আন্দোলনের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে এমন ধারণা হতে পারে—হলে দোষ দেওয়া যায় না, এই আন্দোলনের প্রায় সবটুকু প্রেরণাই এসেছে পাশ্চাত্ত্য আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের দৃষ্টান্ত থেকে। মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবে ভাবিত হয়েই বোধ হয় এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও প্রবক্তারা কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলবার কাজে নেমেছেন।* এর থেকে কেউ যদি আর একটু অগ্রসর হয়ে অনুমান করেন যে এই-জাতীয় কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে

জাতীয় ঐতিহ্য তথা দেশীয় কাব্যসংস্কারের বিশেষ কোন যোগ নেই তা হলে বোধ হয় তাঁকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। 'কবিতা মেলা'র নামকরণ থেকে শুরু করে তার উদ্যোক্তাদের শ্রেণীস্বরূপ, হাবভাব, প্রচারপ্রক্রিয়া, প্রচারলিপির ভাষা, মেলায় সংবর্ধিত কবিদের গোষ্ঠীগত সাজুয্য ইত্যাদি অনুধাবন করলে ওই অনুমানকে সত্য বলে মনে করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমরা আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পক্ষপাতী বটে এবং তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সর্বপ্রকারে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতেও রাজী আছি, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের খটকা দূর হওয়া দরকার।

'কবিতা মেলা' বা 'আরও কবিতা পড়ো' বা এই-জাতীয় আন্দোলন যদি নিছকই ভুঁইফোঁড় একটা প্রয়াস হয়, তার গোটা অনুপ্রেরণাটাই যদি পশ্চিমী কবিতার খাত বেয়ে এসে থাকে, এ দেশের মনের মাটিতে যদি এই আন্দোলনের কোন শিকড় না থাকে, তা হলে এমনতর আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হওয়া বাস্তবিকই একটু কঠিন। উদ্যোক্তারা তো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন, সম্ভব হলে অমিয় চক্রবর্তীকে আমেরিকা থেকে ধরে এনে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁদের সম্মাননায় আমাদের বলবার কিছু নেই—আপত্তি করবারও কিছু নেই সবিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠবারও কিছু নেই—,কিন্তু এখনও তাঁদের মাথার উপর একাধিক বর্ষীয়ান খ্যাতনামা কবি বেঁচে আছেন, কই তাঁদের সংবর্ধিত করবার কথা তো এঁদের কখনও মনে হয় না! সংবর্ধনা তো পরের কথা, এঁরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন কি না সে বিষয়েও বোধ করি সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। মনে রাখতে হবে এখনও আমাদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় এই দুই বর্ষীয়ান কবি বিশেষ সক্রিয়ভাবেই বেঁচে আছেন! তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতার

প্রাচুর্য বাংলা কাব্যকে এখনও নব নব দানে সমৃদ্ধ করে তুলছে। বয়সের দিক থেকে তার পরের সারিতেই আছেন কাজী নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শান্তি পাল, কৃষ্ণধন দে, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত, কানাই সামন্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, উমা দেবী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিমান কবিকুল। কই, এঁদের নাম তো কখনও সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনগুলির সঙ্গে জড়িত হতে দেখি না। এঁরা বয়সে কিঞ্চিৎ প্রবীণ বলেই বুঝি আধুনিক কাব্য-আন্দোলন থেকে খারিজ হয়ে গেলেন? কবিদের শক্তিমত্তা পরিমাপনের আগ্রহ নেই, কাব্যবৈশিষ্ট্য বোঝবার চেষ্টা নেই, শুধু তথাকথিত আধুনিকতা দুর্বোধ্যতা ভঙ্গিসর্বস্বতার লেবেলমাফিক একদল কবিকে জাতে তোলবার আর-এক দল কবিকে জাতে ঠেলবার চেষ্টা। পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার জ্ঞানের মূঢ় অভিমান এবং আধুনিক শহুরে বিজাতীয়তা এই গোটা কাব্য-আন্দোলনের আস্টে-পৃষ্ঠে লেপ্টে আছে বলে আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু ওই আন্দোলনের প্রবক্তাদের বোঝা উচিত, বিদেশী কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিতি যদি একটি গুণপনার নিদর্শন হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে জাতীয় কাব্য-সংস্কারের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব অনুরূপ ভাবেই প্রচণ্ড একটি মূঢ়তা বলে ধিক্কৃত হওয়া উচিত। বরং বিদেশী কাব্যকলার সঙ্গে অপরিচয় মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু দেশীয় কাব্য-ঐতিহ্যের বিষয়ে চৈতন্যহীনতা কী-জাতীয় কাব্য-শিক্ষার পরিচয় বহন করে তা বোধ করি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন করে না।

আজকের সমাজের বিশেষ ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে দেখা যায়, শিক্ষা কথাটির অর্থই যেন বেঁকেচুরে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। অর্ধপক্ক ইংরেজী সাহিত্য-শিক্ষার প্রচণ্ড সমাদর,

এদিকে সত্যিকারের জাতীয় সাহিত্য ও কাব্যকলার জ্ঞান অনাদরের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। দু-চারটে বিলিতি বুকনি ঝাড়তে পারলেই শিক্ষার কৌলীন্য অধিগত হয়ে গেল; পক্ষান্তরে, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ও তত্তৎ সাহিত্যের গভীর রসানুভূতি কোনরূপ গুণপনাই যেন নয়। আধ-পাতা ইংরেজী কিংবা ফরাসী কাব্যের জ্ঞান ধাতস্থ হয়েছে কি হয় নি তাইতেই অভিমান কত; এদিকে প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যের ট্রাডিশন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মুখে রা যোগায় না। যুগধর্মের মানদণ্ড অনুসারে, বিজাতীয় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকেই বলে 'শিক্ষিত' ব্যক্তি; প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়তো সমাজে কোণঠাসা হয়েই আছেন। উপরে যে-সব প্রবীণ কবির নাম করা হল তাঁরা যে বিদেশী কাব্যকলার আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কে অচেতন তা নয়, বরং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সংস্কারে বিলক্ষণ লালিত; কিন্তু এঁদের একমাত্র অপরাধ এই যে, এঁদের মানসিকতা ও কবি-কল্পনার মূল জাতীয় মৃত্তিকায় দৃঢ়রূপে সংস্থিত; বিদেশী কাব্যের অকিড থেকে এঁরা এঁদের প্রাণরস আহরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন না। আজকের সাহিত্যের ধারা-ধরন এমনই হয়েছে যে জাতির প্রাণের সঙ্গে যোগ থাকাটাই যেন একটা বড় ভুল; যিনি যত বেশী জাতীয় সাহিত্য-সংস্কার থেকে দূরে যেতে পারবেন তাঁর তত বেশী সাহিত্যপ্রাজ্ঞ, কাব্যকুশল বলে অভিনন্দিত হবার সম্ভাবনা। দৃষ্টিভঙ্গীর ও বিচারের দোষে, যেটা গুণপনার অভাব রূপে নিন্দিত হওয়া উচিত, সেইটিই প্রকাণ্ড গুণপনা রূপে চারিদিকে প্রশংসিত হচ্ছে। কোথায় দেশজ কাব্য-সংস্কারের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাকে আমরা মাথায় করে রাখব, তা নয়, দেখবার ভুলে তারই উপরে আমাদের যত আক্রোশ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমান আমাদের মাথাটি খেয়েছে।

সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলন নিয়ে যাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন তাঁদের

উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু এইখানেই তাঁদের যত অপূর্ণতা। তাঁরা তাঁদের কাব্যোৎসাহকে এক বিশেষ কুলগোত্রচিহ্নমণ্ডিত কবিগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখছেন। কাব্য সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের ধারণার ফলে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুতেই নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে প্রসারিত হতে চাইছে না। এঁদের চোখে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের তুল্য কবি নেই। এঁদের চোখে, এমন কি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্তও কিঞ্চিৎ 'সেকেলে' ভাবাপন্ন কবি; তবু যে এঁদের তিনজনকে আধুনিক কাব্যপাঠের মজলিসে পাত দেওয়া হয় সে শুধু এঁদের অন্যতর ব্যক্তিত্বের জন্য। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের একজন মুখর প্রবক্তা; অজিত দত্ত অধুনা-নিষ্প্রভ হলেও তাঁর এককালীন 'কুসুমের মাস' আর 'নষ্ট চাঁদ'-এর খ্যাতির জন্য এখনও টিকে আছেন; আর প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দেবদুর্লভ ভাগ্যের কথা তো সুবিদিত। তাঁর কাব্যগুণ অনির্ণীত হলেও এই ভাগ্যের জন্যই সম্ভবতঃ তিনি প্রবীণ ও নবীন কবিকুলের মধ্যে সেতুস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক, নবীন কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটী হচ্ছে এইখানে যে, এঁরা ঐতিহ্যের সঙ্গে বিধিমত সম্পর্ক স্থাপন না করেই আধুনিক কাব্যকলার আন্দোলন গড়ে তুলতে চান। আধুনিক কবিতা হঠাৎ-গজানো কোন বস্তু নয়; ঐতিহ্যের সঙ্গে পরম্পরা রক্ষা করেই আধুনিক কবিতা তার বর্তমান আকার ও প্রকৃতি লাভ করেছে। অথচ নবীন কাব্যামোদীদের ভাবখানা এই যে, আধুনিক কবিতার স্বাদ-গন্ধ-মেজাজ রবীন্দ্রোত্তর যুগেরই বিশেষ মানস-পরিমণ্ডলের ফসল; ওর সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক নেই, তেমন সম্পর্ক রক্ষার কোন প্রয়োজনও নেই। এইখানে নতুন কবিরা একটা মারাত্মক ভুল করছেন। দীর্ঘ দিনের অনুশীলনের ফলে বাংলা কাব্যের একটা নিজস্ব সমৃদ্ধ ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে। চর্যাপদের

যুগ থেকে শুরু করে সুবিস্তৃত বৈষ্ণব কাব্যের অধ্যায়, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-কাব্য, শাক্ত-পদাবলী, কবিওয়ালাদের আমল, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল-রঙ্গলাল-হেম-নবীন ও অন্যান্য প্রাক্-রবীন্দ্র কবিকুল এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতা এত বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে যে, ওর মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার স্বভাবটি সুগঠিত ও সুনিরূপিত হয়ে গেছে। বাংলা কাব্যের ছন্দ মিল ধ্বনি, শব্দব্যবহার, অর্থব্যঞ্জনা, বাহ্যিক রূপ এ সবই কয়েক শত বছরের একটানা চর্চার ফলে একটা বিশিষ্ট রকমের দ্যোতনা লাভ করেছে, যা একান্ত ভাবে বাংলা কাব্যেরই নিজস্ব। বাংলা কাব্যের এই বিশেষ গড়নটিকে আজকের দিনে চিনে নিতে ভুল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভুল আমরা প্রায়শঃ করি। আধুনিকতার অভিমানী এ কালের অন্যথা-শক্তিমান একাধিক কবির মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের কবিদের ধারা-ধরনের সঙ্গে পরিচিত না হলেও চলে, আধুনিক কবিতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্তমান কাব্য-রচয়িতাদের পক্ষে একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার আদর্শ ও প্রকরণ অবলম্বন করাটাই যথেষ্ট। আধুনিক কবিরা আজকাল সম্ভব হলে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করেন। তাঁদের গোটা কাব্য-প্রেরণাটাই তাঁরা আহরণ করবার চেষ্টা করছেন আধুনিক বিদেশী কাব্য-কলার একান্ত-সাম্প্রতিক চঞ্চল উদাহরণ ও অভ্যাস থেকে। এর ফল বাংলা কবিতার অগ্রগতির পক্ষে মারাত্মক না হয়ে যায় না। হয়েছেও তাই। একাধিক আধুনিক কাব্য-রচয়িতার শক্তি শুধু তাঁদের এই অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য-মনস্কতার জন্যই বহুলাংশে খর্ব ও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এঁরা যে-পরিমাণ পাশ্চাত্ত্যপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, ঠিক ততটাই জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে অচেতন। অচেতনতার মূলে রয়েছে শ্রদ্ধার অভাব। বাংলা কাব্যের দীর্ঘকালপুষ্ট ধারাবাহিক সংস্কারকে শ্রদ্ধা করবার মত উপযুক্ত

মানসিকতার অভাব থেকেই তাঁদের মনে ওই ন্যূরঅচৈতে সূত্রপাত হয়েছে। দেশজ কাব্যের ঐতিহ্যকে জানবার তাঁদের কোন আগ্রহই নেই তো তাঁদের ভিতর ঐতিহ্যচেতনা উন্মেষিত হবে কী প্রকারে। নয় তো তাঁদের ভিতর বুদ্ধি, বিদ্যার ধার ও গ্রহণক্ষমতার কিছু কমতি আছে এমন মনে করবার হেতু নেই। এ অক্ষমতার প্রশ্ন নয়, এ শুধু অনুচিত স্থানে ঝোঁক আরোপের সমস্যা। আধুনিক কাব্যরচয়িতারা যেখানে যে গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত নয় সেখানে সেই গুরুত্ব ন্যস্ত করে বাংলা কাব্যসংসারে একটা বিসদৃশ অবস্থা পাকিয়ে তুলেছেন। জাতীয় কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবহেতু তাঁদের মনে স্বতঃই যে মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সেই শূন্যতা তাঁরা ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার অত্যুৎসাহী অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এভাবে কি কখনও মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করা যায়, না, তার কাব্য-ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো যায়? মাইকেল মধুসূদন বিদেশী কাব্যরীতির একনিষ্ঠ অনুশীলনকারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাল্যে-অর্জিত জাতীয় কাব্যের সংস্কারও তাঁর মনে কম দৃঢ়-প্রোথিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় কাব্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-বারিধি মন্থন করে তার শ্রেষ্ঠ সুফল আত্মগত করবার পর তবে বিদেশী কাব্যকলার অনুশীলনে যত্নপর হয়েছিলেন। স্বদেশীয় কবিকুলের রচনা উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করে তিনি শেলী কীটস্ টেনিসন ব্রাউনিঙের রচনাপাঠে প্রবুদ্ধ হন নি। রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্যের ভূমির উপর কত দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান ছিলেন তা তাঁর কাব্যের অন্তর্‌প্রকৃতি একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। অথবা কবিপ্রধানের দৃষ্টান্তের কী প্রয়োজন, বহুগুণ স্বল্পতর কৃতিত্বের ক্ষেত্রে বিরাজমান এমন যে প্রমথ চৌধুরী, যাঁকে আমরা আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের একজন প্রধান রসিক বলে জানি, তাঁরও ঐতিহ্যজ্ঞান কত পাকা ছিল তা তাঁর 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর কবিতার বাঁধুনি,

শব্দব্যবহার, বিষয় অনুসরণ করলেই বুঝতে পারি। এঁদের মানসিকতায় একটা সাম্য ও সুসঙ্গতি ছিল; এখনকার আন্দোলনকারী অধিকাংশ কবির মধ্যেই এই সৌষাম্যের অভাব।

জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী কিংবা তৎপরবর্তী আরও আধুনিক ধারার রূপয়িতাদের মধ্যে কবিত্বশক্তির অপ্রতুলতা আছে এমন কথা বলা যায় না। শুধু তাঁরা সেই কবিত্বের পরিস্ফুটনের জন্য যে প্রকাশ-মাধ্যম বেছে নিয়েছেন তা যথেষ্ট পরিমাণে ঐতিহ্যসম্মত রীতি-পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়—এখানেই তাঁদের কবিতার অপূর্ণতা। তাঁদের রচনার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে অভিযোগ করা হয়, সেই সঙ্গত অভিযোগটির মূলে রয়েছে তাঁদের ঐতিহ্যজ্ঞানের অভাব। তাঁরা যে ভাষা বা ভঙ্গির আশ্রয়ে তাঁদের কাব্য-কল্পনাকে পাঠক-সাধারণ্যে উপস্থিত করেছেন, যে আঙ্গিকের অবলম্বনে তাঁদের কাব্যভাব বিস্ফারিত হয়েছে, তা ঐতিহ্য-ক্রমাগত বাংলা কবিতার ভাষা বা ভাবগত অভ্যাসের সঙ্গে প্রায়-সম্পর্করহিত; এ জিনিস একান্তভাবেই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার সংস্কারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে দুর্বোধ্যতা অবধারিত, আর এই দুর্বোধ্যতার চড়ায় ঠেকে তাঁদের কবিতার অন্তর্নিহিত কল্পনার সৌন্দর্য প্রায়শঃ বানচাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বাংলা দেশের পাঠকসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব ব্যাপ্ত করতে পারেন নি তার কারণ তাঁদের শক্তির দৈন্য নয়, তার কারণ তাঁদের শোধনাতীত বিজাতীয় অভ্যাস। স্বরচিত কবিতায় বিদেশী আদর্শকে আত্যন্তিক প্রশ্রয় দান করতে গিয়ে তাঁরা সাধারণ বাঙালী কাব্যপাঠকের অভ্যস্ত আদর্শ ও রীতিনীতি থেকে নিজেদের একেবারেই দূরে সরিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের কাব্যের সঙ্গে বাংলা দেশের জন-জীবনের কোন যোগ নেই। এ কাব্য 'নিতান্তই শহুরে জিনিস'; বিজাতীয় জীবনযাপনপ্রণালীতে অভ্যস্ত নগরনিবদ্ধ ইংরেজী শিক্ষাভিমানী কবিকুলের দ্বারা এ কাব্য সৃষ্ট

হয়েছে। আমাদের দেশের মাটিতে এর কোন শিকড় নেই। আধুনিক ধারার কবিকুলের অগ্রগণ্য জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় 'রূপসী' বাংলা দেশের মাটি জল হাওয়া আকাশ বৃক্ষলতাপাতা ফুল ও পাখির অনুরাগোদ্বেল বন্দনাগান করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর বন্দনার ভাষাটি পুরোপুরি বাংলা নয়। বাংলা ভাষার আবরণে সে ভাষা আধুনিক বিদেশী কাব্যের ভাষাভঙ্গির দ্বারা একান্তরূপে আবিষ্ট। তাঁর কবিতার রূপকল্প, শব্দব্যবহার, বাক্যগঠন ইত্যাদি পুরোপুরিভাবেই বিদেশী মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করছে। জীবনানন্দের ঐতিহ্য-চেতনা যে সবিশেষ দুর্বল ও ফাঁকা ছিল তা তাঁর ভাষাভঙ্গির আদল একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। জীবনানন্দের স্বদেশপ্রেম খাঁটি ছিল, কিন্তু তাঁর ভাষার বিজাতীয়তায় তাঁর জাতীয়তা খর্ব ও খণ্ডিত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার অভিমানীদের নিকট তাঁর কাব্যের যত সমাদর, স্বদেশীয় মেজাজ-বিশিষ্ট কাব্যপাঠকের নিকট তার শতাংশের একাংশও নয়। জীবনানন্দ দাশের উঁচুদরের কাব্যপ্রতিভা ভঙ্গিপ্রাধান্য দুর্বোধ্যতা ও বিজাতীয়তার কারণে অংশতঃ ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বললে আশা করি তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হয় না।

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের প্রবক্তাদের এ জিনিসটি ভাল করে বুঝতে হবে। তাঁরা বিধিমতে ঐতিহ্যের অনুশীলন করুন, তারপর তাঁরা তাঁদের মনের দিগন্তকে দিকে দিকে প্রসারিত করুন, নিশ্চয় তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকবে না। কিন্তু গোড়ায় গলদ রেখে যতই কেন না তাঁরা বিদেশীয়ানার চর্চা করুন তাঁদের শক্তিক্ষয় অনিবার্য এবং পরিণামে তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। গাছের আগায় জল ঢেলে কেউ গাছকে সঞ্জীবিত রাখতে পারে না। বাংলা কাব্যতরুর মূলে ঐতিহ্যের রসসিঞ্চন ছাড়া তাকে মুঞ্জরিত করে তোলবার চেষ্টা বৃথা।

নবপর্যায় বাংলা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এই-যে ভঙ্গি ও দুর্বোধ্যতার প্রাধান্য

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা মনের একপ্রকার নৈরাজ্যসম্ভূত। কবির মনের কেন্দ্রভূমিটি স্থির নয় বলেই তাঁর মন কখনও অস্পষ্টতা কখনও ভঙ্গির উৎকেন্দ্রিতার মধ্যে দোলায়িত হচ্ছে। তাঁর এই অস্থিরতার মূল কারণ মনের শিকড়হীনতা। যে-মন কেন্দ্রবিচ্যুত অস্থির নিয়ত-দোদুল্যমান, তা কখনও স্পষ্ট স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। প্রাঞ্জলতা সে মনের ধর্ম নয়। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা ও অস্বচ্ছতা তার স্বভাবনিহিত অস্থিরতাকেই শুধু প্রকট করে তুলছে মাত্র। যে মন এই-জাতীয় রচনায় ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেই মনের পশ্চাতে ঐতিহ্যের কোন শিকড় নেই বলেই চেষ্টা করেও সে তার ভাবনাকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। ঐতিহ্যের অনুশীলনের একটা বড় লাভ এই যে, তার দ্বারা প্রাঞ্জলতা অধিগত হয়, মনের ভাব প্রকাশে পরিচ্ছন্নতার কৌশল আয়ত্ত হয়। অধিকাংশ আধুনিক কবিই এই দক্ষতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাঁরা তাঁদের দুর্বোধ্যতার দ্বারা পাঠককেও প্রতিহত করেন আপনাকেও প্রতিহত করেন। এর দ্বারা স্বীয় প্রকাশক্ষমতায় অনাস্থাই শুধু পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত ওই অনাস্থার মার পুনরায় এসে লাগে পাঠকসাধারণের উপর। ফলে পাঠক আরও বেশী প্রতিহত হন। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠক ও কবির মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্কই শুধু গড়ে ওঠা সম্ভব।

কিন্তু বলিহারি যাই এই ভঙ্গিপ্রধান কাব্য-আন্দোলনের সমর্থক নবীনবয়সী পাঠকদের। এঁরা নাকি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বলতে অজ্ঞান। এঁদের অনেকেরই এখনও teenage পেরোয় নি, কলেজে মাস্টারমশায়দের কাছে এখনও পড়া বলতে না পারলে ধমক খেতে হয়। অথচ আশ্চর্য, এঁরা কেমন গড়গড় করে অতি-দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতার মানে বলে দিতে পারে, চাই কি এই সব কবিতা পড়ে মুগ্ধ-বিমোহিত হবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাও রাখে!

কফি-হাউস ও রেস্তোরাঁবিলাসী এই সব নবীনেরাই আধুনিক কবিতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। চটি-চটি কবিতা পত্রিকা বার করে এঁরা এঁদের কাব্যোৎসাহকে চারিদিকে বিকীর্ণ করে দিচ্ছে। এঁদের অতিপ্রত্যয়-শীলতা ও অত্যুৎসাহী ধারা-ধরন দেখে এক-এক সময় নিজেদের প্রতিই কেমন যেন অশ্রদ্ধা জাগে। তবে কি আমরা কাব্যোপভোগের ক্ষেত্রে এইসব বালখিল্যদেরও পশ্চাতে পড়ে আছি? আমাদের কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে, সাহিত্যের যৎসামান্য অভিজ্ঞতাও হয়েছে বলে সবিনয়ে দাবি করতে পারি। অথচ দেখা যায়, যে কবিতা আমাদের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে, শত মাথা কুটেও যে কবিতার অর্থ নিষ্কাশন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না, সেই দুর্বোধ কবিতার অর্থোদ্ধার এঁরা কেমন অবলীলায় নিষ্পাদন করেন। এঁদের বোধবুদ্ধি আমাদের তুলনায় কত পরিণত! ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল হলে কী হবে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা এঁদের নখদর্পণে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা ব্যাখ্যা করতে প্রাণান্ত, এদিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থ এঁদের নিকট জলবৎ তরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই অসঙ্গতির রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করবে? কে বলে দেবে এই প্রদর্শনবাদী আধুনিক কাব্য-প্রীতির মূল কোথায় নিহিত?

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, আধুনিক কবিতার আন্দোলন যে পাঠক-সমাজের কাছ থেকে যথেষ্ট-পরিমাণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারছে না, তা যে আশানুরূপ জোরালো হয়ে উঠছে না, তার অন্যতম হেতু আধুনিক কবিতাকে ঘিরে আপাত-বিজ্ঞ অকাল-পক্ক বালখিল্যদের উৎসাহের বিকার। বালখিল্যদের উৎপাতমুক্ত হলে আধুনিক বাংলা কবিতা তার অগ্রগতির পথে একটা বড় বাধা উত্তীর্ণ হবে বলে মনে করি।

বাংলার মফঃস্বল শহর

॥ ১ ॥

প্রবন্ধের শিরোনামায় 'বাংলা' কথাটাই ব্যবহার করলাম। যদিও আজ বারো বছর হতে চলল 'পশ্চিম' ও 'পূর্ব' নামে বাংলা দেশ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। নামের অখণ্ডত্ব রক্ষা করবার যুক্তি এই যে, বর্তমান নিবন্ধে বাংলা দেশের যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে, তা রাজনৈতিক বিভাগ দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলিলপত্রের দ্বারা একটা দেশকে একাধিক ভাগে ভাগ করলেই যে তার রূপ খণ্ডিত হয়ে যায় এমন নয়। বিশেষতঃ, দেশের সাংস্কৃতিক রূপ, ভৌগোলিক সংস্থানজনিত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সহসা পরিবর্তন হয় না। দেশের মানচিত্র আর দেশের প্রাণচিত্র এক নয়। হয়তো কালক্রমে দেশের প্রাণচিত্রেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপবিকার ঘটবে এবং এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রূপবিকার এমন অবস্থায় এসে পৌঁছয় নি যাতে করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অখণ্ড 'বাংলা' নামের ব্যবহারে আপত্তি ঘটবে। অন্ততঃ এখানে আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছি সে প্রসঙ্গে বাংলা নামটিই সমধিক প্রযোজ্য। 'পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল শহর' কিংবা 'পূববাংলার মফঃস্বল শহর' এমনতরো ভেদাত্মক নাম যুক্তিসহ নয়।

গ্রাম আর নগর এই নিয়ে দেশের আবয়বিক সম্পূর্ণতা। এক প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দুর মত অগণিত সংখ্যক পল্লী; অন্য প্রান্তে জনতাবহুল কর্মকোলাহলময় কিছুসংখ্যক পরিস্ফীত নগর। দেশ বলতে সাধারণতঃ

আমরা এই দুই প্রকারের জনপদের যোগফলকেই বুঝে থাকি। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি স্তর আছে, যার হিসাব নেওয়া দরকার। সে হল দেশের মফঃস্বল শহর। বিশেষ করে বাংলা দেশ সম্পর্কে এ কথাটি বিশেষ ভাবে খাটে। বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিকে বাংলার তৃতীয় প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে। কি পশ্চিম কি পূর্ব, কি উত্তর কি দক্ষিণ, বাংলার সকল অঞ্চলেই মফঃস্বল শহরগুলির রূপ মূলতঃ এক। অঞ্চলভেদে স্থানিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হেতু এই রূপের হয়তো কিছু অদলবদল ঘটতে পারে, তবে একটু তলিয়ে দেখলেই মফঃস্বল শহরগুলির আকার ও প্রকারের অভিন্নতা ধরা পড়বে।

বাংলার যে-কোন একটি মফঃস্বল শহরকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক। সে যেন গ্রাম ও নগরের মধ্যে একটি সংযোগ-চিহ্ন। তার কিছুটা পল্লী-ঘেঁষা, কিছুটা নগর-ঘেঁষা। শহরের প্রান্ত যেখানে এসে মিলেছে, সেখান থেকে প্রান্তরের শুরু, একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক হয়তো ধানজমির হরিৎ আস্তরণের ভিতর দিয়ে দূর পল্লীর দিকে চলে গিয়েছে নিজেকে বিস্তৃত করতে করতে। রাস্তার অদূরেই সমান্তরাল রেখায় বয়ে চলেছে শহরের বুক চিরে বেরিয়ে আসা ছোট্ট পাহাড়ে নদী। রাস্তার চলমান পথিকের চোখে নদীর রূপালী পাত ঝিলিক দিয়ে উঠছে। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে রাস্তাও বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আখের জমি। হয়তো অদূরেই রাস্তার ধারে নিতান্ত অযত্নে আখ-মাড়াইয়ের যন্ত্রপাতি কিংবা গুড় জ্বাল দেবার কয়েকটি প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা কড়া অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কবে সরকার এই অঞ্চলে গুড়শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তার নিষ্ফল চিহ্ন। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে আরও কিছুদূর গেলে হয়তো রাস্তার ধারে পাওয়া যাবে একটি একক পান-বিড়ির দোকান। খড়ের বা হোগলার চালার নিচে নিতান্ত এবড়ো-খেবড়ো

চেহারার বিরল-উপকরণ দীন পণ্য-কেন্দ্র। দোকানের সামনেটা গোবর-জল দিয়ে নিকোনো, তার উপর দুটি বাঁশের মাচা বসবার জন্যে। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে শহরে যাওয়া-আসা পথিকদের গতিপথে যতিচিহ্ন। ক্ষণিকের বিশ্রাম, উৎকণ্ঠার বিস্মরণ।

এইভাবে বর্ণনা আরও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু তার আবশ্যক নেই। এখানে বলবার কথা হচ্ছে এই যে, মফঃস্বল শহরের উপান্ত আর পল্লীতে যেন বড় জড়াজড়ি মাখামাখি। কোথায় যে শহরের শেষ আর পল্লীর আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। নগর, অর্থাৎ বড় বড় শহরের উপান্তগুলি ঠিক এ ধরনের নয়। শহরতলীগুলি শহরই বটে, শুধু আয়তনে আর সঙ্গতিতে যা তফাৎ। কলকাতায় শহরতলী যে কটি আছে তাদের এখানে-সেখানে ফাঁকা প্রান্তর অনেক আছে। এমন কি চেষ্টা করলে ধান-জমিও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাদের কোনমতেই পল্লী-অঞ্চল বলে ভুল করবার জো নেই। বরং কলকারখানা আর শ্রমিক বস্তির আধিক্যে সেগুলির রূপ নগর অপেক্ষা আরও রুক্ষ, আরও বিবর্ণ।

মফঃস্বল শহরগুলির রূপ ঠিক তার উল্টো। সেখানে শহর আর পল্লী একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। শহর আর পল্লীর সে এক দো-আঁশলা রূপ। শহরের উপান্তে যেমন আখের খেতের সঙ্গে আখ-মাড়াইয়ের কল শহর আর পল্লীর আত্মীয় সম্পর্ক ঘোষণা করছে, তেমনি শহরের ভিতরেও একই দ্বৈত রূপের অসংশয় প্রকাশ। রাস্তার পাশে একদিকে খানা ডোবা ব্যাঙের ডাক ঝোপঝাড় জঙ্গল যেমন আছে, আছে এঁদো পুকুরের পাশে নল-খাগড়া আর বেতবন, তেমনি অন্যদিকে জজ সাহেবের বাড়ীতে আছে আধুনিক কায়দায় তৈরি কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। তাতে বিলিতি পাম আর সাবু, ইউক্যালিপটাস আর ঝাউ গাছ থেকে শুরু করে বিদেশী মরসুমী ফুলের গাছের রকমারি নমুনা

সব আছে। জজ সাহেবের দুগ্ধপোষ্য সুসজ্জিত শিশু দুটি প্রতি বৈকালে নেপালী আয়ার জিম্মায় পেরাম্বুলেটরে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়, এদিকে রাস্তার ওপাশের বাড়ীতে কেরানীবাবুর উলঙ্গ শিশুপুত্র দুটি বিনা যত্নে উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। শহরের মাঝখানে কীর্তনের আখড়া আছে কালীবাড়ী আছে, এমনকি মাঠের মধ্যিখানে শ্মশান-কালীর পূজোর থান থাকাও বিচিত্র নয়, যেখানে সম্বৎসরের বিশেষ তিথি কিংবা কারও 'মানসিক' উপলক্ষ্যে একবার কি দুইবার মায়ের পূজো দেওয়া হয় এবং পূজা-অন্তে উৎসর্গ-করা বলির পাঁঠা লুব্ধ অপেক্ষমান গৃধিনীকুলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে আছে খৃষ্ট-উপাসনার গির্জা, অস্ট্রেলীয় মিশনারীদের পরিচালিত 'সান্‌ডে স্কুল', পাদরি সাহেবের ঝাউবীথি-মর্মরিত বাংলোর পাশে স্কুলের বাড়ী। ছেলেরা পরমানন্দে রামায়ণ মহাভারতের গল্প পড়ে, ছবি দেখে, ওদিকে 'সান্‌ডে স্কুলের' উপহার বিদেশী রঙিন ছবি পেলেও তাদের খুশির অন্ত থাকে না। একটি মেয়ে ফুলের সাজি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড় আর নদীর পটভূমিতে আঁকা-বাঁকা বনপথের উপরে সুদৃশ্য রঙিন একটি বাড়ী, কিংবা মাঠে অসংখ্য মেষ চরে বেড়াচ্ছে এই-যে সব 'সান্‌ডে স্কুলের' বর্ণময় ছবি, এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সুখোজ্জ্বল একটি রঙিন চিত্র যেন অজান্তে ছেলে-মেয়েদের মনে তার গাঢ় ছাপ রেখে যাচ্ছে। শিশু মন অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি স্বপ্ন-সুন্দর কল্পনায় প্রত্যক্ষ করছে, আবার একই কালে তার মানসপটে ভবিষ্যৎ বিশ্ববীক্ষা আঁকা হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের সন্ধিভূমিতে দাঁড়ানো মন অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে প্রতিনিয়ত দোল খেয়ে ফিরছে।

শুধু যে এই এক ব্যাপারেই এমন তা নয়। সকল ব্যাপারেই মন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে। তার অর্থ মফঃস্বল শহরের আবহাওয়ায়

বর্ধিত মানুষমাত্রই দ্বৈত প্রভাবের অধীন: তার স্বভাবে গ্রাম আর শহর, অতীত আর ভবিষ্যৎ, আধুনিকতা ও প্রাচীনতা এক আধারে মিশে আছে। উপরে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হল তাতে যদি এ কথার সম্যক্ প্রমাণ না হয়, তা হলে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিই। ভোরে ছেলেরা বিছানা ছেড়ে উঠবার সময় দুর্গা নাম উচ্চারণ করে, উঠানে এসে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' সূর্য-প্রণাম করে, এদিকে একই সময় তাদের কানে ভেসে আসতে থাকে দূরে পুলিশ লাইন্স্-এ কুচকাওয়াজ-রত সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর মহড়ার বিউগ্লের আওয়াজ। বিউগ্লের আওয়াজ আর সূর্যমন্ত্রে জড়াজড়ি মেশামেশি হয়ে বালকমনে এক অদ্ভুত সম্মোহের সৃষ্টি করে। ছেলেরা পুজাপার্বণ উপলক্ষ্যে যাত্রা শোনে কথকতা শোনে কবিগান শোনে হরি-সঙ্কীর্তন শোনে; এদিকে ভ্রাম্যমাণ বায়োস্কোপ কোম্পানী এলে পর্দার গায়ে দুঃসাহসিক বিদেশী গাঁটকাটা, খুনে-ডাকাতের কীর্তিকলাপ দেখে রোমাঞ্চিত হতেও ছাড়ে না। শহরের মাঠে যখন সার্কাসের তাঁবু পড়ে, শহরে একটা হৈ হৈ রব পড়ে যায়। সার্কাসের বিচিত্র খেলাধূলার আকর্ষণ এমনিতেই যথেষ্ট রোমাঞ্চকর; কিন্তু আকর্ষণের সেইটিই একমাত্র কারণ নয়। বাহিরের প্রত্যক্ষ সংযোগ-বর্জিত মফঃস্বলের বালক যখন সার্কাসের তাঁবুর নীচে মহারাষ্ট্রবাসী ও মাদ্রাজী, চীনাম্যান ও জাপানীকে একত্র ক্রীড়ারত দেখে, তার মনে বহির্বিশ্বের বিচিত্র মানবমণ্ডলীর এক মোহময় আভাস চকিতে খেলে যায় এবং সে আভাস তাকে ক্ষণকালের জন্যে বাহিরের জগতের বিরাট পটভূমির উপর নিক্ষেপ করে। স্কুলে বালক পড়ুয়া প্রায় সকলেই সমশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। শীর্ণ হাত-পা, জীর্ণ পোশাক, গলায় ময়লা, মাথায় উকুন, ছেঁড়া-খোঁড়া বই-খাতা, ভাঙা সেলেট, কিন্তু এরই মধ্যে এমন দুই-একটি ছেলে মাঝে মাঝে পড়তে আসে, যেন স্বর্গের দেবদূত। ফর্সা রঙ, গোলগাল চেহারা, পরনে নিকার-বোকার, পায়ে জুতো, চুল

পরিপাটি আঁচড়ানো, দেহ মার্জিত, সঙ্গের বইপত্র কাঁধ থেকে বিলম্বিত ব্যাগে সমাসীন। দেখলেই মনে হয় অচিন দেশের কোন রাজপুত্র পথের ভুলে এই নাম-না-জানা শিশুর দঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়েছে—স্বাভাবিক অবস্থাগতিকে এর এখানে আসবার কথা নয়। মনোহর-দর্শন বালক-আগন্তুককে দেখে ছেলেদের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার কিছুটা পুলক কিছুটা সম্ভ্রম কিছুটা ঈর্ষা। ছেলের দল স্পষ্টই বুঝতে পারে নতুন পড়ুয়া তাদের স্বগোত্রীয় কেউ নয়; তার শ্রেণী আলাদা' কৌলীন্য আলাদা। এ কৌলীন্য পিতার ধনমহিমায় পুষ্ট, মায়ের সযত্ন স্নেহে লালিত। হয়তো পিতা সরকারের কোন বড় চাকুরে, বদলি হয়ে এই অজ-পাড়াগেঁয়ে শহরে এসেছেন, তাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অভিজাত স্কুলের অভাবে ছেলেকে পড়তে দিতে হয়েছে মধ্য আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যেখানে পড়ে, সেই বৈশিষ্ট্যবর্জিত সাধারণ ইস্কুলে। এরকম ছেলে ক্বচিৎ কখনও পড়তে আসে, কিন্তু যখন আসে, সারা ইস্কুলে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ছেলেরা সুন্দর সুসজ্জিত বালকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উন্মুখ হয়, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। যে ছেলে ভাব জমাতে পারে. সহপাঠীদের চোখে তার মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।

ব্যাপার সামান্যই, তবে তার গূঢ়ার্থও একটা আছে। আগন্তুক বালকের প্রতি ছেলেদের আত্যন্তিক সম্ভ্রমের মনোভাব এবং তার সঙ্গে আগু বাড়িয়ে আলাপ জমাবার আগ্রহ আপাতদৃষ্টিতে চিত্তের দীনতা মনে হতে পারে, কটু সমালোচক তাকে 'হ্যাংলামি' আখ্যাও দিতে পারেন; কিন্তু এই মনন আর কথন সহানুভূতিপ্রসূত নয়, সেটা বলা দরকার। ছেলেদের এমনতরো আচরণের পিছনে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল রয়েছে তার ভিতর নগরের প্রতি মফঃস্বলধর্মী শহরের শ্রদ্ধাবিমিশ্র মুগ্ধ ভাবটাই প্রধান। আর আছে উচ্চ জীবনযাত্রার প্রতি নিম্নমান জীবনযাত্রার

সকাতর দীর্ঘশ্বাস। দেবদূতপ্রতিম কুমার কিশোর এক-একটি ছেলে আসে, আর অযত্নে অবহেলায় অভাবে ও রিক্ততায় আজন্মবর্ধিত সাধারণ দরিদ্র গৃহের ছেলেদের সামনে যেন একটা সুন্দর অদেখা জগতের আভাস বয়ে আনে। সেই জগতে অভাব নেই, দৈন্য নেই, দিনানুদৈনিক সংগ্রামের কৃচ্ছ্রতা নেই, আছে শুধু অমলিন হাসি অফুরান গান অনাবিল প্রেম। অমেয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণ এমন জগতের প্রতি আকৃষ্ট না হবে তো কিসের প্রতি হবে?

অধিকাংশ গৃহের চেহারাই জীর্ণ, তবে রাস্তার মাঝে মাঝে সুদৃশ্য অট্টালিকাও চোখে পড়ে। কোঠাবাড়ির সংখ্যা শহরের যেদিকটায় হাটবাজার, সেদিকটায়ই বেশী। হাটের রাস্তার উপর তামাকের আর চিটেগুড়ের আড়ৎ, চাউলের আর মসুর কলাইয়ের গুদাম যেমন আছে, তেমনি আধুনিক কেতা-দুরস্ত সর্বার্থসাধক সুসজ্জিত ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরও আছে। গোরুর গাড়ি আর মোটর গাড়ির পাশাপাশি নিনাদে রাস্তা সচকিত। জ্বালানি-সদৃশ শুকনো মাছ বোঝাই সারি সারি গোরুর গাড়ি ক্যাঁচোরকোঁচোর শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে ধীরমন্থর গতিতে বাজারের অভিমুখে চলেছে—এ দৃশ্য একমাত্র মফঃস্বল শহরেই দেখা যায়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কতিপয় শহরে। · রাস্তায় কোনদিন ঝাঁট পড়ে, কোনদিন পড়ে না।···রাস্তার আলো ইলেকট্রিকই হোক আর কেরোসিন বাতিই হোক, শুক্লপক্ষে জ্বলে না, কেন না এটা মফঃস্বল শহর, চাঁদের আলো এখনও এখানে অবান্তর জ্ঞানে বর্জিত হয় নি। নগরের চাঁদ ছাদের আড়ালে অদৃশ্য, তাই কাত হয়েও কেউ তার দিকে তাকাবার ফুরসৎ পায় না।···মিউনিসিপ্যালিটির তৎপরতায় কলের জলের সরবরাহ শহরবাসীর অধিগম্য হয়েছে, এদিকে শহরে পুকুরেরও কমতি নেই। ফাঁক পেলেই লোকে পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করে আসে। কোন কোন পুষ্করিণীর ধারে ফাঁকা জমির বিস্তার, তাতে তাল-নারিকেল-

সুপারির সমারোহ। বাগানগুলি বৎসরের হিসাবে ইজারা দেওয়া হয়ে থাকে—স্থানীয় মালিক জমিদারেরাই সে ব্যবস্থা করে থাকেন।

নগরবাসীর মত মফঃস্বল শহরের মানুষের জীবনে অবসর এত কৃপণ নয়; তাই ছুটির দিনে পুকুরে মাছ ধরবার ধূম পড়ে যায়। খেলার মাঠে কোন বড় খেলা হলে সমস্ত শহর যেন সেখানে ভেঙে পড়ে। কয়দিন একটানা বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য (কিংবা তার অভাব) সম্পর্কে জোর আলোচনা চলে; তারপর অন্য নূতন কোন উত্তেজনার বিষয় সমুপস্থিত হতেই আলোচনার স্রোত পুরনো খাত ছেড়ে নতুন খাত বেয়ে গড়িয়ে চলে। বাইরে থেকে যখন উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রার দল আসে কবির দল আসে, উত্তেজক আলোচনার নূতন ভিত্তি প্রস্তুত হয় এবং আগত যাত্রাপার্টির সম্ভাব্য দোষগুণ নিয়ে ক'দিন নিন্দা-প্রশংসামুখর কলকোলাহলের অন্ত থাকে না।

ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর। বৈচিত্র্যবিহীন তার দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রার ছন্দ। যেন এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত হ্রদ, সহজে তার জলে ঝিলিমিলি কাটে না। কিন্তু যখন কাটে, মুহূর্তেই জল তোলপাড় করে তোলে। হ্রদের জলে তখন দূর-সমুদ্র-গর্জনের আলোড়ন জাগে। ক্ষুদ্র আশাবাসনা-তাড়িত মন আকাশের চাঁদ হাতে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাংলার মফঃস্বল শহরবাসীর জীবনে এমনিতরো অভাবিতপূর্ব আন্দোলনের কম্পন জেগেছিল কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে। কোন দিকে কিছু নেই, লোকে যথারীতি আপিস-আদালত করছে, ছেলেরা স্কুলে কলেজে যাচ্ছে, অকর্মা আর বেকারের দল শহরের কেন্দ্রমধ্যস্থিত চৌরাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানে বিধিমতে আড্ডার আসর জমাচ্ছে; হঠাৎ কিসে যেন কী হয়ে গেল। গান্ধীজী অসহযোগের ডাক দিলেন। প্রতিটি মফঃস্বল শহর যেন তড়িৎস্পৃষ্টবৎ সে ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল। এমন সাড়া পল্লীতে জাগে নি, নগরে

জাগে নি। দেখতে দেখতে স্কুল-কলেজ খালি হতে লাগল, আপিস-আদালতে ভিড় কমল। চলল সভা-সমিতি আর 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনিত শোভাযাত্রার অন্তহীন মহতী পুনরাবৃত্তি। সে কী উত্তেজনা, সে কী জীবন-চাঞ্চল্য! প্রাণ-বলিদানের আগ্রহে শিহরিত এমন জীবনচাঞ্চল্য ইতঃপূর্বে কেউ কখনও দেখে নি।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনে বাংলার কয়েকটি মফঃস্বল শহরে গান্ধীজীর শুভ পদার্পণ ঘটেছিল। গান্ধীজীকে অনুসরণ করে এলেন আলি-ভ্রাতৃদ্বয়, এলেন আরও জনকয়েক সর্বভারতীয় নেতা। সেদিনের স্মৃতি বিস্মৃত হবার নয়। কোন্ এক অলৌকিক জাদু-স্পর্শে মফঃস্বল শহরগুলির রূপ যেন রাতারাতি আমূল বদলে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার কলঙ্কলাঞ্ছিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে চলতে গিয়ে যেখানে সাধারণ হর্ষবিষাদ, সাধারণ পাওনা-দেনার হিসাব নেওয়ার বাইরে মন চলতে চাইত না, পরচর্চায় আর অকিঞ্চিৎকর আলোচনায় দিনগুলি অক্লেশে কেটে যাচ্ছিল, সেই বৈচিত্র্যবিবর্জিত তরঙ্গ-বিক্ষোভহীন হ্রদের জলের শান্ততায় সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে এলেন গান্ধীজী। তারপর থেকে সমুদ্র-ঝড় মাঝে মাঝেই মফঃস্বল শহরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার মফঃস্বল শহরের দান সবচেয়ে বেশী—এ কথা বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। মফঃস্বল শহরে এমন এক ধরনের যুবাবৃন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, যাঁরা মফঃস্বল শহরেরই মানুষ—পল্লীতে কিংবা নগরীতে এঁদের পাওয়া যাবে না। এঁদের অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহের সন্তান, এঁদের বাপ-পিতামহ চাকুরিব্যপদেশে শহরে ছিটকে এসে পড়েছিলেন, তারপর থেকে স্থায়িভাবে শহরেই থেকে গেছেন। এখন পল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক সরু সুতোয় ঝুলছে—ন'মাসে-ছ'মাসে একবার মুখ পল্লী-অভিমুখী হয়।

কারও কারও তা-ও হয় না; একেবারেই পল্লীর পাট তুলে দেওয়া হয়েছে। জমির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ-সম্পর্ক নেই, যাঁদের টিকে থাকা না-থাকা নির্ভর করছে শুধুমাত্র চাকুরির উপর, তাঁদের বেপরোয়া হবার পথে বাধা অল্প। জীবনে পাওনার দিক কম বলে সমাজের কাছে বাধ্যবাধকতাও কম। যার চাল আছে চুলো নেই, চুলো আছে চাল নেই, অথচ মোটামুটি শিক্ষা-দীক্ষা আছে, সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে নতুন কিছু করার দুঃসাহস তাদের মধ্যেই বেশী থাকা সম্ভব। আর বাস্তবতঃ তা-ই ঘটে, আমরা দেখি। রক্ষা করার মত পার্থিব সম্পদ বিশেষ কিছু যাদের নেই, রক্ষণশীলতা কখনও তাদের মধ্যে দানা বাঁধতে পারে না।

মফঃস্বল শহরের এইসব আপাতছন্নছাড়া তরুণেরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা সুবিদিত। অনেকে স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দানেও কুণ্ঠিত হন নি। ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন তাঁদের একটি মোটা অংশ যে এই শ্রেণীর যুবক সম্প্রদায় থেকেই এসেছিল তার সাক্ষ্য আছে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের আগ্রহ এই শ্রেণীর মানুষের অন্তরে প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়েছিল কেন, পরে এক সময়ে কেন গোপনতা-প্রয়াসী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সুড়ঙ্গ-পথের অন্ধকারে এঁদের নিয়ত আনাগোনা চলেছিল, কেন এঁদের আত্মবলিদানেচ্ছা কুণ্ঠা বা ভীতির দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি, উপরের বিশ্লেষণ একটু অনুধাবন করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

মফঃস্বল শহর পল্লী আর নগরীর মধ্যে হাইফেনস্বরূপ, সে কথা পূর্বে বলেছি। দুইয়ের মধ্যে সে যোগসূত্রের কাজ করছে। নগরীর অতি-পরিস্ফীত কদাকার বিস্তৃতি থেকে যেমন সে মুক্ত, তেমনি পল্লীর নিরাভরণতাও তার বৈশিষ্ট্য নয়। পল্লীতে রিক্ততা, নগরীতে অতিরিক্ততা

—মাঝখানে মফঃস্বল শহর একটা পরিমিত সুষমার বৃন্তের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে বিরাজ করছে। এর মানুষগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও পল্লী আর নগরী জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। একদিকে কূপমণ্ডুকতা, অন্যদিকে বিশ্ববীক্ষা। পল্লীসমাজের ব্যক্তিত্ব-অবদমনকারী যৌথ প্রভুত্বের সংস্কার লঙ্ঘন করে আসা হয়েছে, এদিকে নগরীর অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও ধাতস্থ হয় নি। প্রতিবেশীর বিপদে অবিচলিত থাকবার নগরীসুলভ কুঅভ্যাস থেকে মফঃস্বল শহর আজও নিজেকে দূরে রেখেছে। মফঃস্বল জীবনের গতি মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে। তাতে কর্ম আছে ব্যস্ততা নেই, দায়িত্ব আছে ভার নেই। ব্যস্ততা আর দায়িত্ব-ভারশূন্য জীবনে অবকাশের সুযোগ অবারিত—এই অবকাশ নানাভাবে ভরে ফেলা হয়েছে। গালগল্প আড্ডা গান খেলাধূলা ব্যায়াম, সভা-বৈঠকাদি কোন কিছুরই অভাব নেই। পরচর্চা আছে আবার পরসেবাচর্চাও আছে। ছুটির দিনে ছেলেদের পল্লী-অঞ্চলে দল বেঁধে বেড়াতে যাবার রেওয়াজ যেমন আছে, তেমনি কোন ফাঁকায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অকারণ গুলতানি করবার রেওয়াজও কম চলতি নয়। ছেলেরা বাতাবী লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে, গাছের ডাল ভেঙে হকি-স্টিক বানায়, আবার প্রয়োজন উপস্থিত হলে যথার্থ ফুটবল আর হকি-স্টিকও 'কায়দা' করতে পারে। ডাংগুলি আর লাটিম, মার্বেলখেলা আর ঘুড়ি-ওড়ানোয় ছেলেদের অনেকখানি সময় কাটে। এদিকে উপরের মহলে বড়দের মধ্যে টেনিস আর বিলিয়ার্ডস্-এরও চলন আছে।

ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর, কিন্তু মানুষের রকমারি নমুনা। কবে কোন্ এক ইরানি বেদে শহরে মেওয়া বিক্রি করতে এসেছিল, জায়গাটি মনে ধরায় এখানেই থেকে গেছে। এখন বাজারের উপর ফলের দোকান দিয়ে দিব্যি জমিয়ে বসেছে। তার পাশেই হয়তো সর্বানন্দপুরের কুড়িরাম দাসের বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল। ইরান দেশ আর বাংলার পল্লী

গায়ে-গায়ে মিশে আছে। এক ফরাসী সাহেব এসেছিল ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে এখানে বেড়াতে। কেন জানি না বিয়ে-সাদি করে এখানেই ঘর বাঁধল। কিনল জমি জমা জোত। নিজের হাতে চাষ ধরল, বাগান করল, পুকুরে মাছ জীয়োল। দেখতে দেখতে ফরাসী সাহেবকে ঘিরে এক নাতিবৃহৎ কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠল, যার মূলে কৃষিকাজ। সাহেব এখন বুড়ো হয়েছে, ছেলেরা চাষ-আবাদের কাজ দেখে। সকলেই চমৎকার বাংলা বলতে পারে। কোন্ এক অতীতে ফরাসী দেশে তাদের বাড়ি ছিল, আজ আর তা বারেকের জন্যে কারও মনেও হয় না।···কয়েকটি পশ্চিমা পরিবার এক সময়ে এখানে বাট্টার কারবার করতে এসেছিল, এখন স্থায়ী বাসিন্দা শ্রেণীর অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাদের নামে একটা পাড়াই দাঁড়িয়ে গেছে—'দেশোয়ালি পট্টি'। বাড়িতে হিন্দী বাংলা দুই চলে, বাইরে নির্ভেজাল বাংলা। এদের মধ্যে একটি পরিবারের কর্তা বিরাট জমিদারী কিনে এখন অর্থকৌলীন্যে শহরের গণ্য-মান্যদের একজন। শহরে এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নেই, যার সঙ্গে তাঁর নামের যোগ নেই।

উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হল তা একটি বিশেষ শহরকে মনে করে দেওয়া হলেও অল্পবিস্তর সকল মফঃস্বল শহর সম্পর্কেই সে কথা খাটে। বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই এক প্রকারের, শুধু খুঁটিনাটিতে তফাৎ এই মাত্র। নানান জাতের নানান মানুষের ভিড়ে নগরীর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ; কিন্তু ওই বৈচিত্র্যটিতে যেন স্বাদ নেই। যেখানে দু'পা বাড়ালেই বিদেশীর মুখ চোখে পড়ে, বিচিত্র মানুষের ভিড় ঠেলে সর্বদা পথ চলতে হয়, সেখানে অপরিচয়ের আকর্ষণ বড় একটা থাকে না; সবই এক প্রত্যাশিত বৃহৎ অনিবার্যতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মফঃস্বল শহরে এমন নয়। এক জাতের অনেক মানুষের জটলার মধ্যে যদি একটি দুটি ভিন্ন-জাতীয় মানুষ দেখা যায়, সকলের সেটা বিশেষ করে চোখে পড়ে। এবং

সেই অপরিচিত মানুষকে ঘিরে বিস্ময়বিমিশ্র কৌতূহল আপনা থেকেই উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। তাতে শিহরণ আছে, পুলক আছে।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যে বাংলার মফঃস্বল শহরের বর্ণনা খুব বেশী চোখে পড়ে না। পল্লী এবং নগরী আমাদের লেখকদের সবটুকু মনোযোগ দখল করে আছে—মাঝখানে মফঃস্বল শহর বলে একটা বস্তু আছে, সেটা যেন তাঁদের চোখেই পড়তে চায় না। রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে মানুষের হৃদয়নীড় এবং নগরীকে মানুষের কর্মস্থল (office) বলে বর্ণনা করেছেন। তার সঙ্গে মফঃস্বল শহরের রূপবর্ণনা যোগ করলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে। মফঃস্বল শহর যেন গৃহ থেকে কর্মস্থলে যেতে-আসতে মাঝ-পথের বিশ্রাম-কেন্দ্র। তাকে আড্ডাখানাও বলা যেতে পারে। শুধু আপিস আর বাড়ি করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না; মনের স্বাস্থ্যের জন্য তার আরও কিছু খোরাক প্রয়োজন। মফঃস্বল শহর মানুষের জীবনে সেই উদার অবকাশের প্রতিশ্রুতি বয়ে নিয়ে এসেছে; তাই সে মনোহর, তাই সে প্রিয়।

মফঃস্বল শহর বাংলা সাহিত্যে অনাদৃত। তার মানে এ নয় যে, একেবারেই সেদিকে কেউ ঘেঁষেন নি। বর্তমানের দু'একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের রচনায় মফঃস্বল শহরের অতি নিপুণ বর্ণনা চোখে পড়ে। মফঃস্বল শহরের চাকুরিয়া সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ চরিত্র আছে—কোন কোন কথাসাহিত্যিক (যেমন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) তাঁদের বিভিন্ন গল্পে এই চরিত্রটিরই বিশ্লেষণ করেছেন। মফঃস্বলে কার্যরত উচ্চবর্গের চাকুরিয়াদের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্যকরতা মূঢ়তা, তাঁরা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের ছুরিকাঘাতে চিরে-ফেঁড়ে দেখিয়েছেন। তাঁদের এ-জাতীয় রচনায় কৌতুকরসেরও অসদ্ভাব নেই। যেখানেই সম্ভব

হয়েছে, বিদ্রূপের তিক্ততাকে প্রসন্ন কৌতুকে নমনীয় করা হয়েছে, । গল্পের উপভোগ্যতা তাতে বেড়েছে। আধুনিক গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ মফঃস্বল শহরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন, এটা আশার কথা। এই শ্রেণীর লেখকের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

এক সময় 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় সাঁওতাল-পরগণার শহর ঘটনার পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু সে রেওয়াজ এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাঁওতাল-পরগণার শহরগুলিতে বাংলার মফঃস্বল শহরের খানিকটা আদল পাওয়া যায়, কিন্তু বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। বাংলার শহরের পল্লীগন্ধিতা সাঁওতাল-পরগণার শহরে নেই, এ কথা যাঁরাই সাঁওতাল-পরগণায় বেড়াতে গেছেন স্বীকার করবেন। কিন্তু সাঁওতাল-পরগণা বিহারে অবস্থিত, অতএব বাংলা দেশ সম্বন্ধীয় আলোচনায় তার স্থান নেই।

বিদেশী সাহিত্যে প্রাদেশিক শহরের পটভূমিকায় বহু গল্পোপন্যাস রচিত হয়েছে। ইংরেজী, রুশ, ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান সব প্রধান প্রধান সাহিত্যেই এর নজির আছে। ভিকি বামের 'Results of an Accident' বলে একটি উপন্যাস পড়েছিলাম। উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য যাই হোক, প্রাদেশিক শহরের বৈশিষ্ট্যের এমন নিপুণ চিত্রণ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। একটি ক্ষুদ্র জার্মান প্রাদেশিক শহর এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। লেখিকার রচনাগুণে শহরটি তার দোষগুণ নিয়ে পাঠকের চোখে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র শহর Lowinkel তার গতানুগতিক প্রাত্যহিকতা বৈচিত্র্যহীনতা সঙ্কীর্ণতা নীতিভীরুতা অভিযোগহীনতা ইত্যাদি নিয়ে ঢিমে-তেতালা লয়ে গতিপথে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। নক্ষত্রের মত দূরবর্তী স্বপ্নকুহেলিময় শহর বার্লিন থেকে চারজন বিশিষ্ট আগন্তুকের

আবির্ভাবে Lowinkel-এর অভ্যাসমস্থণ গণ্ডীবদ্ধ জীবন তচনচ হয়ে গেল। এই 'দুর্ঘটনাই' রচনার উপজীব্য বিষয়। জার্মানীর প্রাদেশিক শহর আর বাংলার মফঃস্বল শহরের ভিতর সাদৃশ্য সামান্যই, তবে মানুষের মন নামক পদার্থটি নাকি সর্বত্রই এক। এই কারণে পরিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও Lowinkel-এর মানুষগুলির মধ্যে বাংলার মফঃস্বল শহরের মানুষগুলিকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

বাংলার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে মফঃস্বল শহর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মফঃস্বল শহরের এই গুরুত্ব সাহিত্যে সম্যক্ প্রতিফলিত হবে এ আশা সঙ্গতভাবেই করা যায়।

।। উপন্যাসের উপাদান ।।

কোন কোন মহলে এই রকমের একটি কথা উঠেছে যে, বর্তমান বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবন সার্থক উপন্যাসসৃষ্টির এক প্রধান অন্তরায়। কথাটির নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, সার্থক উপন্যাস রচনা করতে হলে চাই উপযুক্ত উপাদান—দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষময় জীবন ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে এই উপাদান আহরণ করা যায় না। বর্তমান বাঙালী-জীবনে দ্বন্দ্বসংঘাতের উপাদান খুবই কম; তার প্রবাহ নিতান্তই নিস্তরঙ্গ একটানা লয়ে বয়ে চলেছে। এই একান্ত শান্ত স্থির উত্থান-পতনের বিক্ষেপবর্জিত স্রোতোহীন জীবনের রূপায়ণ বৈশিষ্ট্য-চিহ্নবিযুক্ত হতে বাধ্য। জীবনে সমৃদ্ধি নেই তো উপন্যাসে সমৃদ্ধি আসবে কী করে!

কিন্তু এ কথা স্বীকার করা যায় না। বাঙালী-জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব আছে সন্দেহ নেই, তা বলে তার রূপায়ণমূলক সাহিত্যেও সমৃদ্ধির অভাব ঘটবে এমন কী কথা আছে? বৈচিত্র্য আর সমৃদ্ধি সমার্থক নয়। বৈচিত্র্যহীন জীবন নিয়েও চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যদি লেখকের কলমে জোর থাকে। আসলে চাই দেখবার চোখ আর অনুভবের ক্ষমতা, এবং সেই পর্যবেক্ষণ ও অনুভবের ফলকে সার্থকভাবে প্রকাশের নৈপুণ্য। এই দ্বিবিধ শক্তির অভাবে অতি বৈচিত্র্যময় আর দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনও সাহিত্যে ফলপ্রদভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা অনেক সময় আমাদের নিজেদের অক্ষমতাকে বাইরের অবস্থার উপর চাপিয়ে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রেও যে সেরকম কোন যুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয় নি, সে কথা জোর করে বলবার উপায় নেই। এ যেন নাচতে না জানলে উঠোনকে বাঁকা বলে তার আড়ালে

অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ভাল উপন্যাস লেখা হচ্ছে না সত্যি কথা, কিন্তু তার জন্যে লেখকদের ক্ষমতার অভাবই প্রধানতঃ দায়ী। আপাতবৈচিত্র্যহীন বাঙালী সমাজের উপর দোষ চাপিয়ে লেখকদের পার পাবার চেষ্টার মধ্যে না আছে যুক্তি, না আছে সত্য পরিস্থিতির বর্ণনা।

এ ছাড়াও বিবেচনা করবার মত কথা আছে। সার্থক উপন্যাস বলতে আমরা কী বুঝি? উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রথমে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন, তারপর সেই সংজ্ঞাদৃষ্টে বিচার করতে হবে বাঙালী-জীবনে সার্থক উপন্যাসসৃষ্টির উপাদানের সত্যই অভাব আছে কিনা। উপন্যাসের আর্টের ভিতর কি শুধুই পর্যবেক্ষণ থাকবে? তার পিছনে মননশীলতার কোন পটভূমি কি থাকবে না? উপন্যাস যদি শুধুই পর্যবেক্ষণনির্ভর হয়, অর্থাৎ মানুষকে ও তার জীবনকে যেমন-যেমন দেখা হয়েছে তেমন-তেমন ভাবে তাকে পরিবেশন করাই যদি উপন্যাসকারের মুখ্য কাজ হয়, তা হলে কাহিনী বয়ন ও বিন্যাসের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব উপন্যাস-কারের হাতে থাকে না। সেক্ষেত্রে বর্তমান বাঙালী-জীবনকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে গেলে বৈচিত্র্যহীনতার বাধা কিছুপরিমাণে স্বীকার করে নিতেই হবে। কেন-না এ কথা তো খুবই সত্য যে, বর্তমান বাঙালী-জীবনের, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের, দিনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্যের ওঠা-নামা তেমন-কিছু নেই; এ জীবনের ছন্দ মোটামুটিভাবে সমপদী এবং তার লয় মন্থর। কর্মদ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ-সংঘাতময় পাশ্চাত্য-জীবনের চলার ছন্দের মধ্যে যে ঝাঁপতাল আর সুরফাঁকতালের বিষমপদী উৎক্ষেপ আছে, এই উৎক্ষেপ মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনে দেখা যাবে না। বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাপনপ্রণালীর ছকটুকু শুরুতেই মোটামুটি নির্ভুলতার সঙ্গে এঁকে দেওয়া যায়। জন্ম, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম জীবনে পাঠাভ্যাস ও শিক্ষা, শিক্ষাসমাপনান্তে কর্মজগতে প্রবেশ—কর্ম

মানে প্রায়শঃই সরকারী বা সওদাগরী আপিসে দশটা-পাঁচটার চাকরি, চাকরির মূল্যে বিবাহ, চাকরির বাজারদর অনুযায়ী বিবাহে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ; প্রজনন, সন্তানপালন, কন্যাদায় ; প্রৌঢ়ত্বে যৌবনের স্বপ্নের সমাধি ; সারা জীবনের সঞ্চয়ে কোন রকমে একটি মাথা গুঁজবার ঠাঁই খাড়া করা, বার্ধক্যে গুরুর নিকট দীক্ষা বা কোন মঠ বা মোহান্তের শরণলাভ, নাতি-নাতনীদের অঞ্চলছায়ায় বাৎসল্যরসের অনুশীলন, অন্তিম দশা, চক্ষুর্নিমীলন—এই তো গড়পড়তা মধ্যবিত্তের সারা জীবনের তামামি বা খতিয়ান। এমন যে জীবন, এই জীবনকে সাহিত্যের পাতায় অবিকৃত ভাবে চিত্রায়িত করতে গেলে বোধ হয় বৈচিত্র্যহীনতার অভিশাপ কোনমতেই পুরাপুরি এড়ানো যায় না। বিশেষতঃ, নিছক পর্যবেক্ষণ আর পর্যবেক্ষণের ফল পরিবেশনের মধ্যেই যে-উপন্যাসের পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ও নিঃশেষিত, সেই রচনায় এ-জাতীয় বৈচিত্র্যহীনতা অবধারিত বললেও চলে। জীবনে বৈচিত্র্য নেই তো তার ফোটোচিত্রে বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি থাকবে কী প্রকারে ?

কিন্তু কথা হচ্ছে, মানুষের জীবন তো শুধু বহির্দেশেই চলে না, ভিতরে ভিতরেও চলে। মানুষের যেমন একটা বহিরঙ্গ জীবন আছে তেমনি তার একটা অন্তরঙ্গ জীবনও আছে। প্রায়শ এ দুটি জীবন পরস্পরের সমান্তরালে চলে—একটি আরেকটির নাগাল পায় না। বাইরে থেকে দেখতে যে জীবন নিতান্ত মসৃণ-মন্থর ব'লে মনে হয়, ভিতরে ভিতরেও যে তা অনুরূপ মন্থর-মসৃণ হবে তার কোন কথা নেই। হয়তো সে অন্তর্জীবন অতিশয় জটিল, উচ্চাবচ, বন্ধুর। প্রত্যেক মানুষেরই মনের ভিতর এক বিশাল জগৎ রয়েছে—সে জগতের করণ-কারণ পদ্ধতি-প্রকরণ বহির্জগতের ধারাধরন থেকে আলাদা। চাষীই হোক আর মধ্যবিত্ত গৃহস্থই হোক আর অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষই হোক, প্রতি মানুষই নিজের ভিতর এক জটিল জীবন বহন করে চলেছে। বলা হয়ে থাকে

আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবনের ছন্দটুকু খুবই সরল আর সহজ, কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার আওতায় লালিত ও পুষ্ট ভারতীয় পল্লীসমাজের মধ্যে জীবনের কোন জটিলতা নেই। চাষীদের বাইরের জীবন যেমন জটিলতাবর্জিত, তাদের মনোজীবনও তদ্রূপ।

এ কথা বোধহয় পুরাপুরি সত্য নয়। আমাদের দেশের অতি সাধারণ চাষীর সঙ্গেও কথাবার্তা বললে বোঝা যায়, তাদের প্রত্যেকেরই মন জীবন-রহস্যবোধের দ্বারা সঞ্চালিত, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের মধ্যেই তাদের চিন্তা ও চেষ্টা নিঃশেষিত নয়। ক্ষেতে কাজ করতে করতেই অথবা তার ফাঁকে ফাঁকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক সব প্রশ্ন তাদের মনের দরজায় উঁকি দিয়ে যায়। চাষীদের মধ্যে যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মধ্যে রীতিমত দার্শনিকতার উপলব্ধি রয়েছে। আমার এ মন্তব্য যে নিতান্ত কথার কথা নয়, তা যে শিল্পগত যাথার্থ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প-উপন্যাস পড়লেই বোঝা যাবে। গ্রামীণ সমাজের অতি সাধারণ মানুষের অন্তর্জীবনের গহনে প্রবেশ করে এই অপরিসীম মনোবিশ্লেষণকুশল লেখক তাদের আপাতপ্রচ্ছন্ন দার্শনিক সত্তাটিকে বাইরের আলোতে তুলে এনে ধরেছেন। 'পদ্মা-নদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'অহিংসা' ইত্যাদি যে-কোন উপন্যাস এবং গ্রামজীবনের পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলি পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না, আমাদের দেশের কৃষক শুধু ফসল-উৎপাদনকারী যন্ত্রই নয়, তার অন্তর্জীবনে রয়েছে সহজ জীবন-বোধের গূঢ় দ্যোতনা। জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে সেও গভীর-ভাবে চিন্তা করে। তার সে চিন্তার প্রণালী স্থূলতামণ্ডিত হতে পারে, যুক্তিশৃঙ্খলাবর্জিত হতে পারে; তা হলেও তার সেই আকৃতিকে ভুল করবার জো নেই।

কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচিত নাগরিক মধ্যবিত্তের গল্পগুলির কথা

বলা যেতে পারে। নাগরিক মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যবর্জিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তার মধ্যেও গূঢ় জীবনরহস্যের দ্যোতনা লক্ষ্য করেছেন এবং সেই রহস্যের আভাস পাঠকমনে সঞ্চারিত করে গল্পগুলিকে শিল্পোৎকর্ষের উচ্চগ্রামে উন্নীত করেছেন। শহুরে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন শুধু দিনানুদৈনিক সংগ্রাম নয়, নিছকই প্রাণধারণের গ্লানি নয়; ওই দিনগত পাপক্ষয়ের সংগ্রামের অন্তরালে রয়েছে তাদের নিত্যতরঙ্গোদ্বেল অবিরত-বিক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ বিশাল মনোজগৎ। এই জগতের রীতিপদ্ধতি জানতে ও বুঝতে হলে শুধু ফোটোগ্রাফীর চোখ থাকলেই চলে না, শিল্পীর সত্তায় মননশীলতা ও কল্পনাকুশলতা থাকা চাই। তাঁর ভিতর দার্শনিকতা ও প্রজ্ঞার সংস্কার সহজাত হওয়া চাই। উচ্চ পর্যায়ের উপন্যাসশিল্পী একদিকে যেমন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হবেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ভিতর বৈদগ্ধ্য আর মননক্ষমতাও দৃঢ়প্রোথিত হওয়া আবশ্যক। মননশীলতা আর দার্শনিকতার পটভূমিব্যতিরিক্ত পর্যবেক্ষণশক্তি যতই সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ হোক তা শেষ পর্যন্ত কাহিনীর রস পরিবেশনেই ক্ষয়িত হতে বাধ্য। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাশাপাশি রেখে তুলনা করলেই আমরা এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারব। পরবর্তীকালীন উপন্যাসকারদের মধ্যে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্নকাহিনীনির্ভর কথাসাহিত্যিকদের রচনার প্রতি-তুলনাতেও একই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, উপন্যাসে লেখকের ক্ষমতাটাই হচ্ছে আসল কথা, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের প্রশ্নটি সেখানে বড় নয়। যে লেখকের দেখবার চোখ আছে, উপরন্তু মননক্ষমতা আছে, তিনি ওই আপাতবৈচিত্র্যহীন বাঙালী-জীবন থেকেই সার্থক উপন্যাসসৃষ্টির প্রচুর

মালমসলা আহরণ করতে পারেন। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মনন তথা দার্শনিক উপলব্ধি যুক্ত হলে তার আর মার নেই। যে উপন্যাসে এই দ্বৈত প্রবণতার সার্থক সমাহার চোখে পড়ে, সে উপন্যাস যতই বিরল-উপকরণ আর আপাতসরল কাহিনীভিত্তিক রচনা হোক, শিল্পরসিকের বিচারে তা উৎকর্ষের শিরোপা লাভ করতে বাধ্য। আর তা ছাড়া, সাম্প্রতিক বাঙালী-জীবন একেবারেই বৈচিত্র্যবর্জিত—সে কথাও বোধ-হয় যথার্থ নয়। এই যে অসম ও অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণের চাপে বিপুলসংখ্যক মানুষের মনুষ্যত্বের নিত্য অপচয় ঘটছে, সেই অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত বুঝি কিছু নয়? তা বুঝি আমাদের লেখক-সম্প্রদায়ের কল্পনাকে আলোড়িত করে না? বহিরঙ্গ মধ্যবিত্ত-জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের বর্ণনায় শক্তিক্ষয় না করে আমাদের লেখকেরা কেন এই মনুষ্যত্বের ট্রাজিডিকে তাঁদের লেখায় উপযুক্ত বেদনার গাম্ভীর্য ও মহিমায় ফুটিয়ে তোলেন না? এ ছাড়া যুদ্ধ মন্বন্তর সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেশবিভাগ উদ্বাস্তু-সমস্যা—এ সবও তো সাম্প্রতিক কালেরই ঘটনা। এগুলি সার্থক উপন্যাসসৃষ্টির পক্ষে চমৎকার উপকরণ। সেই উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের নজির সাম্প্রতিক সাহিত্যে কোথায়? কাজেই অবস্থার উপর দোষ চাপানো সাজে না; যদি কেউ এজন্য দায়ী থাকেন, সে লেখক নিজে। এ বিষয়ে লেখকদের আরও গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান করা কর্তব্য।

সমাপ্ত